ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

১৩ জুলাই ১৯৭৯



সাবির



গৌতম



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : সুজিত কুণ্ডু

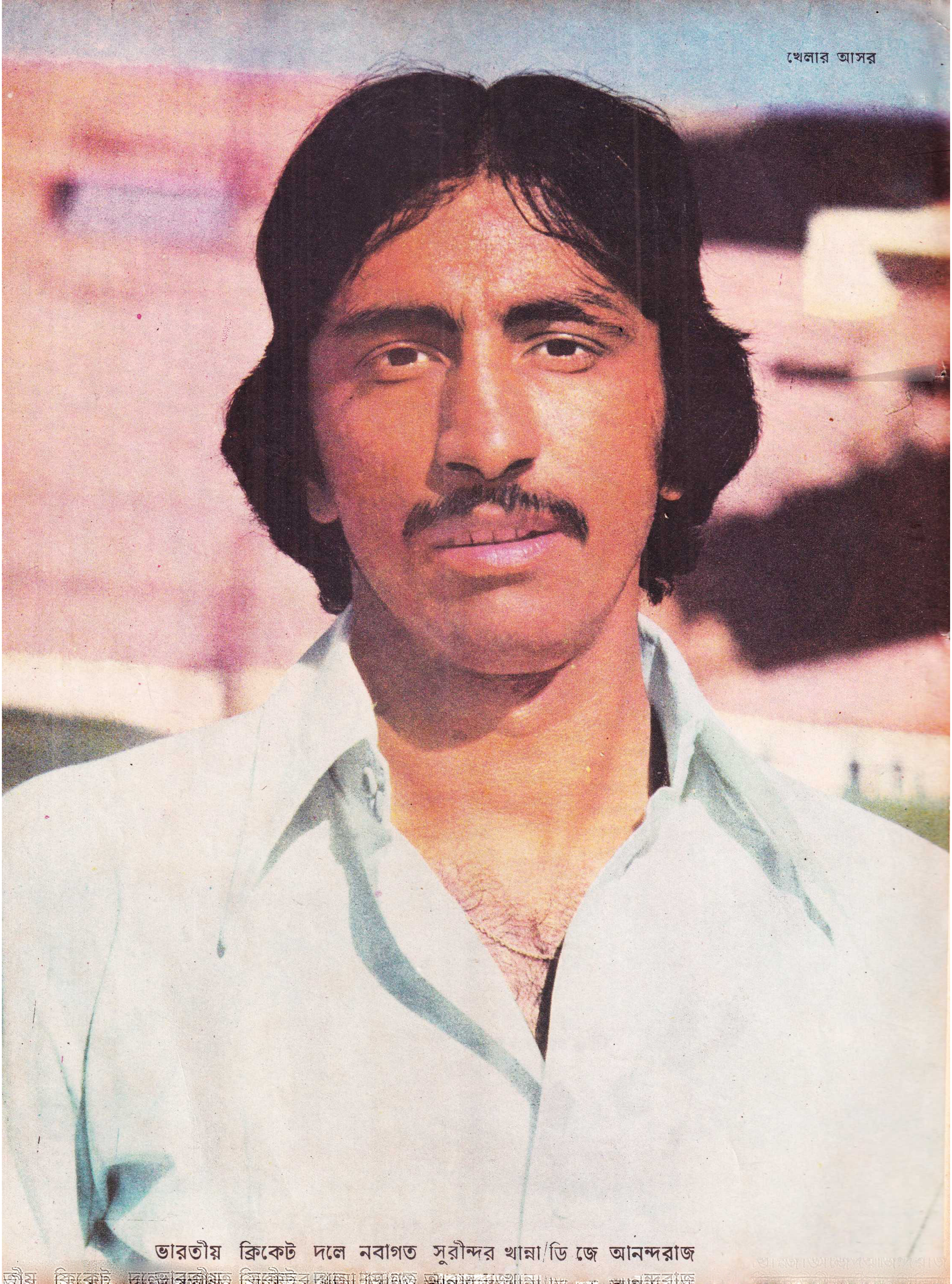
স্ক্যান : অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



ভারতীয় ক্রিকেট দলে নবাগত সুরীন্দর খান্না/ডি জে আনন্দরাজ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ।। সংখ্যা ৯ ।। ১৩ জুলাই ১৯৭৯

মরশুমের 'সেরা' খেলায় ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যখন পয়েন্ট ভাগাভাগি করল তখন লিগ চ্যাম্পিয়ন কে হবে এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হল না। আরও দুটি প্রদর্শনী খেলায় দুই দলকেই মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলতে হবে। প্রথমে মোহনবাগান ২১ জুলাই মহমেডানের সঙ্গে খেলবে এবং ৪ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল খেলবে। মহমেডান স্পোর্টিং এই খেলার ফলে অন্য দুটি বড় দলের চেয়ে এক পয়েন্টে এখন পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইতে তারা আবার ফিরে এসেছে একথা বলা যায়।

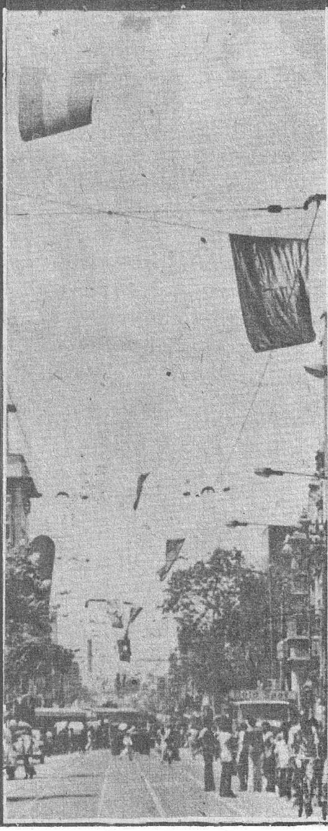
তিনটি দলের প্রতিটি খেলা এখন থেকে নতুন আগ্রহের সঞ্চার করবে, বলা বাহুল্য। আর কোন অঘটন না ঘটে গেলে উত্তেজনা দিন দিন বাড়বে এ কথাও বলা যায় নিঃসন্দেহে। যারা মনে করেছিলেন যে 'সেরা' ম্যাচের পর তারা নিশ্চিন্ত হবেন যে, মাঠের বাইরে ও ভেতরে আর কোন গণ্ডগোল হবে না তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই সকল পক্ষকে এবং বিশেষ করে সরকার ও তার পুলিশ বাহিনীকে সব রকম অশান্তি থেকে কলকাতাকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে আরও তৎপর হতে হবে।

শনিবারের খেলায় দু'দলের সমর্থক এবং খেলোয়াড়রা আশাতীত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন এটা আনন্দের কথা। তবে খেলার ফলাফল অন্যরকম হলে অবস্থা কি রকম দাঁড়াত বলা শক্ত। কিন্তু যা হয়নি তার ওপর মন্তব্য করা যায় না। তবে সাধারণ মানুষ আপাততঃ নিশ্চিন্ত হয়েছেন একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

সম্পাদক : অতুল মুখার্জি
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা : ১·৫০
বিমান মাশুল :
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



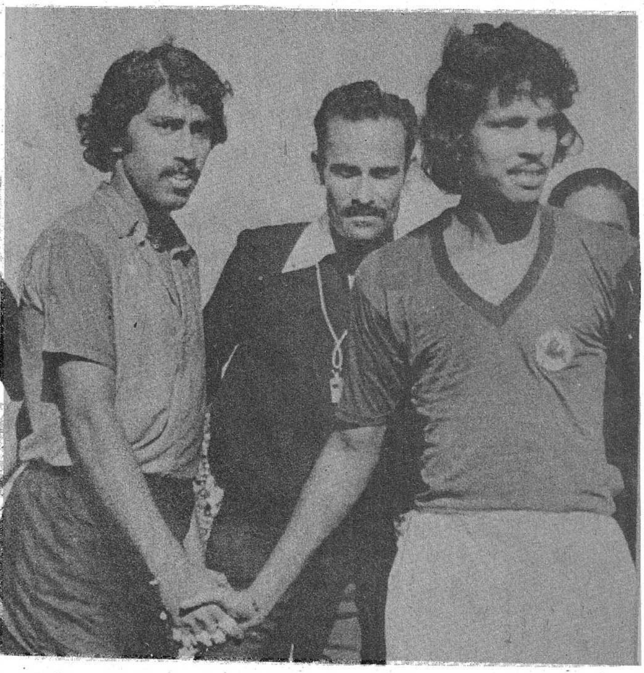


যা আছে

এবারের প্রচ্ছদের ছবি : সমর তরফদার।

অন্যান্য ছবি : পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ, দাস ও অন্যান্য।

মর্যাদার লড়াইয়ে মোহনবাগান ড্র করে লিগের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিল



ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জি ও মোহনবাগান অধিনায়ক দিলীপ পালিত
খেলার আগে/শংকর

দিলীপ সরকারঃ তারা সব চুপচাপ বসেছিল ড্রেসিংরুমে। কে একজন 'গাড়ি রেডি' বলতেই একে একে ঘর ছাড়ল। চিন্ময়ের হেঁট হওয়া মুখ তুলে ধরে সাবির ওকে জড়িয়ে নিয়ে বেরোল সবশেষে। পরাজয়ের ছাপ না থাকলেও কোচ অরুণ ঘোষ থেকে শুরু করে যারা ড্রেস পরেও সেদিন মাঠে যায়নি সেই সাজ্জাদ, মনজিত, তরুণদেরও মুখ দেখে স্পষ্টতই বোঝা গেছে যে, হাতের মুঠো থেকে 'নিশ্চিত জয়' হাতছাড়া হওয়াতেই ইস্টবেঙ্গলের সকলের এই থমথমে ভাবসাব। উনসত্তরের লিগে 'বড়' লড়াইটাই দুই প্রধান সমানে সমানে বাঁটোয়ারা করল। মোহনবাগান গোল খেয়ে গোল শোধ দিয়ে শক্তি যাচাইয়ে খেলার ফল সমান করলেও মান বিচারে উৎরোতে পারেনি। তাই তারা প্রায় হারা ম্যাচটা রুখে দিয়ে গর্ব ভরে নিজ টেন্টে বিশ্রামের জন্য ছুটেছিল মনে কোন উত্তাপ না রেখে।

দু'পক্ষের লড়াই তেমন হাড্ডাহাড্ডি হয় সেইসব নজীর খুবই কম আছে ইতিহাসে। তবে শুরু থেকে প্রথম পঁচিশ মিনিট এদিন ইস্টবেঙ্গলের এত দাপট হবে কল্পনাই ছিল না। আগের বারোটা ম্যাচের একটাতেও তাদের এই বিক্রম দেখা যায় নি। অ্যাটাকিং খেলাটাই যদি ইস্টবেঙ্গলের কৌশলের আগাম পরিকল্পনা হয়ে থাকে তবে কোচ কিন্তু পুরো সাফল্য পেয়েছেন বলা যায়।

কিক-অফের পরের মিনিট থেকেই ইস্ট বেঙ্গল তেড়েফুঁড়ে ধেয়ে যায় বিপক্ষ রক্ষণ এলাকায়। তাদের এত ঘন ঘন তীব্রগতির আক্রমণে বেটাল হয়ে পরে মোহনবাগান ডিফেন্স। রাইট ব্যাক শ্যামলকে একদম অকেজো প্রমাণ করে ডেভিড। মাঝে দুই খ্যাতিমান অভিজ্ঞ স্টপার সুব্রত ও প্রদীপকেও নাস্তানাবুদ করে সাবির ও মিহির। একমাত্র সুরজিত এদিন তার খ্যাতির কিছুই দেখাতে পারেননি।

শুরুর পরেই ইস্টবেঙ্গল গোল পেত যদি সাবিরের সট প্রতাপ না ধরত। আসলে সাবিরের সটটায় তীব্রতা ছিল। কিন্তু সে একা গোলকিপারকে কাটিয়েও ওই সময় গোল পেতে পারত। সাবির বল ছাড়াই বহু সময় ব্যস্ত রেখেছিল সুব্রতকে। ফলে এদিকে মিহিরেরও অনেক সুবিধা হয়েছিল ডিফেন্স চেরার কৌশলে।

ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডদের সাহায্য দিয়েছে দুই লিংকম্যান প্রশান্ত ও দেবরাজ ক্রমাগত বল জুগিয়ে এবং উপর-নীচে সমানভাবে বিচরণ করে।

প্রথমার্ধেই ইস্টবেঙ্গল আরো তিন গোল পেতে পারত। মস্ত বাধা দিয়েছে প্রতাপ। জীবনে এই প্রথম দুই প্রধানের ম্যাচ খেলছে তা কখনই মনে হয়নি তার খেলার ধরনধারণ দেখে। ডেভিডের দুটি ডান পায়ের দুর্দান্ত সট রুখে দেওয়াটাই তার দলের হার না মানার প্রধান কারণ।

সাবিরের হেডে যে গোলটা প্রতাপকে হজম করতে হয়েছে তাতে তার করণীয় কিছুই ছিল না। আসলে বল বেরিয়ে এসেছিল সুব্রতর মাথার উপর দিয়ে। প্রদীপ ও সুব্রতর মাঝখান দিয়েই মূলত ব্যাপারটা তৈরি হয়েছিল। একা প্রতাপকে ফাঁকি দিতে তাই সাবিরের কোন অসুবিধাই হয়নি। তবুও শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝে শেষ চেষ্টার জন্যও প্রতাপ তার দেহটাকে আড়াআড়ি শূন্যে তুলে দিয়েছিল যদি বল আটকানো যায়। ব্যাপারটা ভোলার নয়।

মোহনবাগান গোল শোধ করতে পেরেছে বটে। কিন্তু প্রায় আত্মঘাতী গোলও বলা যায়। চিন্ময় অতদূর থেকে ব্যাক পাস না করে সাইড লাইন পার করে বিপক্ষদের থ্রোর সুযোগ করে দিতে পারতো। তবে চিন্ময়ের ব্যাকপাস দায়ী হলেও ওই অবস্থায় অতো সুন্দরভাবে গোল করার কৃতিত্বটা মানসেরও বড় কম নয়।

হাফ টাইমের পর ব্যাপার স্যাপার বুঝে মোহনবাগান কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি অন্য কৌশলের আশ্রয় নিলেন। প্রথমার্ধে খেলাটার গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং তা ছিল ইস্টবেঙ্গলেরই অনুকূলে। অবস্থা ভেবে তাই মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই খেলাটা ঝুলিয়ে দিল। অর্থাৎ গতিবেগ কমলো এবং ফি বছর দুই প্রধানের লড়াই-এ যেমন ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব দেখা যায়, তাই ঘটল। শ্লথ গতিতে খেলাটাকে নামাবার জন্য দায়িত্ববান ছিল দুই অভিজ্ঞ লিঙ্কম্যান গৌতম ও প্রসূন। গোটা দ্বিতীয়ার্ধ তারা অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রণ করলো শুধু খেলাটাকে মাঝ মাঠে রেখেই না, সময় সুযোগে নিজ ফরোয়ার্ডদের দিয়ে বিপক্ষ রক্ষণে হানা দেবার কৌশল নিয়েও। মানস ও বিদেশ মারফতে তারা ভালো সুযোগ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এদিন দলের অসুবিধা ছিল স্ট্রাইকার নিয়ে। পায়াসের বদলী রঞ্জিত কিছু ভালো খেললেও অপর স্ট্রাইকার শ্যাম মারফতে মোহনবাগান গোল করার মতো সুযোগ পেতে পারেনি।

মোহনবাগানের আক্রমণের যতই চেষ্টা ছিল, তার থেকে বেশি সজাগ ছিল ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স, সমস্ত হানা বরবাদের। মনোরঞ্জন এ ব্যাপারে কোনো সময়েই ব্যর্থতার মখে পড়েনি।

দুই প্রধানের খেলায় ফাউলের আধিক্য ছিল। তবে একটা মস্ত প্রশংসার কাজ খেলোয়াড়রা দেখিয়েছে বার বার। তা হলো ফাউলের পরই একে অপরকে জড়িয়ে বিষয়টার ফয়সলা করে নিয়েছে। বড় ম্যাচের আগে গড়ের মাঠের যে উত্তপ্ত অবস্থা ছিল তা সেদিন দুই দলের খেলোয়াড়রা সুপ্ত হতে যথেষ্ট ভালো নজীর দেখিয়েছে।

বড় খেলা 'ড্র' এর পরে এবারের লিগে এখন অন্য প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং লিগ লড়াই-এর পথে ফিরে আসার সম্ভাবনায় ফিরে এলো। মহমেডানের সঙ্গে বাকি দুটি প্রদর্শনী ম্যাচের গুরুত্বও বেড়ে গেল অনেক বেশী।

মিনিটে মিনিটে

দিলীপ সরকারঃ ২ মিনিট—আগুয়ান বিদেশের কাছ থেকে বল কেড়ে দেবরাজ দেয় চিন্ময়কে। আনমার্কড মিহির পেনাল্টি বক্সের ঠিক বাইরে থেকে সট নিলে বল উড়ে যায় বারের উপর দিয়ে।

৩ মিনিট—প্রশান্তর লম্বা লব পৌঁছয় ডেভিডের পায়ে। শ্যামল ছুটে এসে ডেভিডকে চার্জ করতেই বল তার পায়ে ছুঁয়ে বাইরে যায়। ইস্টবেঙ্গল প্রথম কর্নার পায়। তাই থেকে সুরজিত সত্যজিতকে পেছনে ঠেলে দিলে সে বল বাইরে মারে।

৫ মিনিট—প্রতাপ প্রথম বল ধরে। গুরদেবের লম্বা সট পেয়ে সুব্রতকে কাটিয়ে সাবির অল্প দূর থেকে সট নেয়। সুব্রত বলের ফ্লাইট বুঝতে পারেনি। কিন্তু প্রতাপ ধরে ফেলে।

৬ মিনিট—ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয়বার কর্নার পায়। দেবরাজ মাঝ মাঠ থেকে বল পায়ে ধেয়ে গেলে শ্যামল এগিয়ে এসেও ট্যাকল করতে পারেনি। পরে ডেভিড ধেয়ে গেলে প্রদীপ ওকে সট নেবার কোন ফুরসৎ না দিয়ে চার্জ করে। ইস্টবেঙ্গল তৃতীয়বার কর্নার পায়। সুরজিতের কিক সরাসরি বারের উপর দিয়ে জালে পড়ে।

৭ মিনিট—মাঝমাঠে দিলীপ ফাউল করে মিহিরকে। ফ্রি-কিক করে সুরজিত। গোলমুখে সুরজিতের সট পৌঁছলে সাবির মিস 'কক্ করে এবং পরে ডেভিড জোরালো সট নিলেও প্রতাপ সহজেই ধরে ফেলে।

৮ মিনিট—মোহনবাগান প্রথম ইস্টবেঙ্গল গোলমুখে পৌঁছবার সুযোগ পায়। ডানদিক থেকে মানস অতি দ্রুত ধেয়ে বল ক্রশ করে পেনাল্টি বক্সের ভেতরে। কিন্তু পায়াস অফসাইডে থাকায় কোন ফল হতে পারেনি।

১১ মিনিট—সাবিরের সঙ্গে হেড দিতে গিয়ে প্রদীপের মাথা ফেটে রক্ত ঝরে। পরে সে খেলে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে।

১৫ মিনিট—সত্যজিত ফাউল করে শ্যামকে। গৌতম ফ্রি-কিক থেকে বল পাঠায় ঠিক শ্যামের কাছে। বক্সের ভেতরে থেকেও শ্যাম পায়ে বলে যোগাযোগ করতে পারেনি।

১৭ মিনিট—ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোল



প্রতাপ আরও একটি ইস্টবেঙ্গল প্রয়াস ব্যর্থ করছে/পাহাড়ী

সুব্রত ব্যর্থ, সাবিরের হেড মাথায় চোট পাওয়া প্রদীপ দেখছে বল গোলে ঢুকছে/অরুণ মুখার্জি



করে। মনোরঞ্জনের লম্বা লব পৌঁছয় বক্সের ভেতরে। প্রদীপ জায়গা মতো ছিল না। সুব্রতর মাথার উপর দিয়ে বল বেরিয়ে যেতেই ওত পেতে থাকা সাবির হেড দেয়। প্রতাপের কিছু করার ছিল না। তবু চকিতে তার সুন্দর ডাইভের প্রচেষ্টা ভোলার নয় (১-০)।

২০ মিনিট—শ্যামলের পরিবর্তে নামে কম্পটন।

২১ মিনিট—ডেভিডের দুর্দান্ত ডান পায়ের সট প্রতাপ বাঁচায় ফিস্ট করে। ইস্টবেঙ্গল চতুর্থবার কর্নার পায়। সুরজিতের কর্নার কিক ধরে তা বাইরে মারে সত্যজিত।

২৩ মিনিট—গৌতমের কাছ থেকে বল পেয়ে শ্যাম থাপা এগিয়ে যায়। মনোরঞ্জন তাকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ভাস্কর এগিয়ে এসে বল হাতে তুলে নেয়।

২৬ মিনিট—পেনাল্টি বক্সের সামান্য দূরে সুব্রত ফাউল করে মিহিরকে। ফ্রি-কিকটি সুরজিত বারের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

৩০ মিনিট—মোহনবাগান প্রথম কর্নার পায়। এগিয়ে আসা মানসকে বুঝতে না পেরে সত্যজিত চকিতে বল বাইরে মারে। মানসের কর্নার কিক বাইরে চলে যায়।

৩১ মিনিট—মানসের উঁচু সেণ্টার পড়ে গোল মুখে শ্যাম ও পায়াসের মাঝখানে। মনোরঞ্জন দুর্দান্ত হেডে বল ক্লিয়ার করে।

৩২ মিনিট—দেবরাজের ফরোয়ার্ড পাস পেয়ে ডেভিড ডান পায়ে শক্ত সট নিলে প্রতাপ চকিতে পানচ করে। বল প্রায় ২০ গজ সামনে গিয়ে ড্রপ পড়ে।

৩৩ মিনিট—মোহনবাগান গোল শোধ করে। মনোরঞ্জন বল এগিয়ে দেয় চিন্ময়কে। নিজ গোলের দিকে ফিরে থাকা চিন্ময় প্রায় মাঝ মাঠ থেকে ব্যাক পাস দেয় ভাস্করকে। ক্ষিপ্র গতিতে আনমার্কড মানস ধেয়ে যায় বলের পিছু। একমাত্র ডিফেণ্ডার সত্যজিত এবং গোলকিপার ভাস্করকে ফাঁকি দিয়ে মানস গোল পায় (১—১)।

হাফ টাইম হয়। ফল ১—১।

৩৬ মিনিট—পায়াসের বদলে রঞ্জিত মাঠে নামে।

৩৭ মিনিট—মোহনবাগান দ্বিতীয় কর্নার পায়। গৌতম বাইরে মারে।

৩৮ মিনিট—চিন্ময় সুন্দর সেণ্টার করে গোলমুখে। সাবির উঁচু করে বল ফেলে মিহিরের মাথায়। কিন্তু প্রতাপ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় মিহিরের মাথা থেকে বল তুলে নেয়।

৩৯ মিনিট—মানস বক্সের বাইরে থেকে সট নিলে তা বারের উপর দিয়ে চলে যায়।

৪১ মিনিট—গৌতমের ক্রশ পাস পেয়ে বিদেশ সট নেয়। কিন্তু মনোরঞ্জন হেডে তা বাইরে পাঠায়। মোহনবাগান তৃতীয়বার কর্নার পায়। বিদেশের কর্নার কিক গোলমুখে পড়তেই মনোরঞ্জন তা মাঝমাঠে পাঠিয়ে দেয়।

৪২ মিনিট—দিলীপের চিপ ধরে বিদেশ তরতরিয়ে এগিয়ে যায় তীব্রগতিতে। গোল-মুখে সে বল ঠেলে শ্যামের উদ্দেশ্যে। শ্যাম বল পায়ে ধরার আগেই গুরদেব ক্লিয়ার করে দেয়।

৪৩ মিনিট—মানসের কাছ থেকে ক্রশ পাস পেয়ে রঞ্জিত পোস্টের ধার ঘেঁষে বাইরে মারে।

৪৫ মিনিট—ডেভিডের আরও একটা লম্বা সট ধরে প্রতাপ।

৪৮ মিনিট—মোহনবাগান চতুর্থ কর্নার পায়। গৌতম বাইরে মারে।

৫৬ মিনিট—গৌতমের প্রায় ৩০ গজের একটা শক্ত সট ভাস্কর ধরে।

৫৮ মিনিট—সুরজিতের বদলী নামে সুভাষ।

৬৬ মিনিট—কম্পটন ওভারল্যাপ করে সত্যজিত ও গুরদেবকে ডজ করে এগিয়ে সট নিলে মনোরঞ্জন হেডে ফেরায় বডি সোয়ার্ভ সহযোগে।

৬৮ মিনিট—চিন্ময়ের উঁচু সেণ্টার পড়ে বক্সের ভেতরে, সাবির হেড দেবার চেষ্টা করেও ফ্লাইটে পায়নি। প্রদীপের ফিরিয়ে দেওয়া বল পেয়েও সুভাষ গোলে সট নেবার ফুরসত পায়নি।

ইস্টবেঙ্গল জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হল

স্বরাজ ঘোষ ঃ একক লিগের সেরা খেলা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ। সেটা শেষ হল ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে। নিঃসন্দেহে এই গুরুত্বপূর্ণ খেলার পরেও উত্তেজনা বজায় থাকবে। এই খেলাকে কেন্দ্র করে কত আকাশ কুসুম কল্পনাই না রচনা হয়। তাতে খেলার মেজাজকে আরও চড়া করা তোলে। সেই কড়া মেজাজের শিকার হলে যে ফল পেতে হয়—ইস্টবেঙ্গল সেই ফলই পেল।

খেলার মাঠ ও পরিবেশ ছিল অতি চমৎকার, যাকে এককথায় বলে নিখুঁত। খেলা যেমন শুরু হল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। ইস্ট-বেঙ্গল উত্তেজনার তালে প্রথম সুযোগ পেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। মোহনবাগানের রাইট সেণ্টার ব্যাক সুব্রত ভট্টাচার্য ভুল নির্বাচনের কবলে পড়ে 'মিস ভলি' করলেন। ফলে সাবিরের কাছে এক লোভনীয় পুরস্কার এসে গেল। ধারে কাছে কেউ নেই। শুধু গোলকিপার পাঁচ হাত দূরে। আমরা সবাই ভাবলাম সাবির সাজিয়ে ধরে বলটাকে গোলে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু হুড়োহুড়ি করে সাবির তা হাতে তুলে দিল। এই মারাত্মক মিসটা হল উত্তেজনাবশত। সাবিরের মস্তিষ্ক তখনও গরম। ভাবলাম ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবে। ঠিক পর মুহূর্তেই ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের চাপের মধ্যে সাবির আবার আরেকটা লোভনীয় সুযোগ পেল। সেটাও হাতছাড়া করল।



মোহনবাগান গোল শোধ করল—গোলদাতা মানস মাটিতে, বাঁদিকে জেভিয়ার পায়াস, শ্যাম ও চিন্ময় চ্যাটার্জি/পাহাড়ী

তখন মাঠের উত্তেজনা তুঙ্গে। খেলাটা চলছিল একপেশে। ইস্টবেঙ্গলের চাপ সহ্য করতে মোহনবাগান ডিফেন্স হিমসিম খাচ্ছিল। এমন সময় মিহির একটা ফাঁকা বল পেয়ে গেল। এবার ভাবলাম, বুঝি গোল হল। আবার মিস। বিরক্তি এসে গেল। গুরুত্বপূর্ণ খেলায় কটা সুযোগ পাওয়া যায়? আর এইভাবে সুযোগগুলো নষ্ট হচ্ছে? এর কি কারণ থাকতে পারে? এরা পরিণত খেলোয়াড় ও জাতীয় দলের জার্সি গায়ে পরেছে। এরা কি এখনও এই বিজ্ঞান জানেনা যে—নিজেকে ব্যালান্স করতে হলে বলের দিকেও তাকাতে হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে নজর করতে হয়। যাকে বলে—বল ও প্রতিপক্ষের সম্পর্ক রেখে ব্যালান্স করতে হয়। আরও তাদের জেনে রাখা উচিত—অপারেশন করার আগের কাজ হল, 'অবজারভেশন' অর্থাৎ পরিস্থিতি ও প্রতিপক্ষের অবস্থান দেখা। কিন্তু এরা

.ছিল সবই উল্টো। তাই চলতি কথায় .লগুলি জমা পড়ছিল। যখন জায়গা নেওয়ার কথা তখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। সকলেরই জানা সাবিরের হেড ভাল। আবার সুব্রতরও ডিফেন্সিভ হেড ভাল। এবার সুব্রতর মিস। সাবির শূন্যে লাফিয়ে উঠে বলকে হেডে ডিফ্লেক্ট করে দিল। বল গোলে ঢুকল।

বলতে দ্বিধা নেই। প্রথম পর্বে ইস্ট-বেঙ্গলের খেলায় যে দানা বেঁধে উঠেছিল চারটি স্বর্ণ সুযোগ তাদের ভাগ্যে এসে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে তারা প্রথম পর্বে ৩—০ গোলে এগিয়ে থাকতে পারত।

ওইদিকে মোহনবাগান এত খাপছাড়া ও এলোমেলো ফুটবল খেলছিল যে তা দেখে মনে হয়েছে তারাও উত্তেজনা ভারে সব বুদ্ধি বিচার, নির্বাচন ও ক্রীড়া দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম পর্বে সুব্রতকে দেখে মনে হয়েছে, সে এক অপরিণত খেলোয়াড়, বড় যুদ্ধে কখনও নামেনি। গৌতম ও প্রসূন যথেষ্ট হাল ধরতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওদের যে হাতিয়ার বিদেশ ও মানস, দেখে মনে হচ্ছিল ওরা তখন খাপের মধ্যের তলোয়ার। আর এই পর্বে ডেভিড উইলিয়মস ছিল সত্যিই ক্ষুরধার। তার একটি সট মনে রাখার মত। প্রতাপ অদ্ভুতভাবে তা রক্ষা করেছে। ➡

দ্বিতীয় পর্বের মোহনবাগানের চালচলন একইরকম রয়ে গেল। জানি না কোচের কি নির্দেশ ছিল। খেলা দেখে মনে হয়নি কোচের নির্দেশ খেলোয়াড়রা পালন করেছে। মোহনবাগানের কোচ প্রদীপকে বার বারই উত্তেজিত হতে দেখেছি। জানি না খেলোয়াড়দের আরও উত্তপ্ত করতে তার এই টেকনিক ছিল কিনা। ওই সময় প্রদীপের উত্তেজিত হওয়াটা কি ঠিক? তাহলে তার ছেলেরা কখন ঠাণ্ডা হবে ও ধীর মস্তিষ্কে খেলবে? ছেলেদের ভুল করবার সুযোগও দিতে হবে। তবেই ত তারা নিজেকে ফিরে পাবে। প্রথম পর্বে চিন্ময় ও ভাষ্করের ভুল বোঝাবুঝির ফলে মানস যে গোলটি দিল, তাছাড়া আর কি মনে রাখবার মত মোহনবাগানের খেলায় ঘটেছে?

যদিও দ্বিতীয় পর্বে ইস্টবেঙ্গলই যেন ভুলে গিয়েছিল তারা প্রথম পর্বে কি খেলেছে। তার মধ্যেও আবার মিহিরের মারাত্মক মিস। বোধ হয় সেটা দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে। আবার সেই ব্যালান্সের ভুল। কেন তিনি বলকে পায়ে না নিয়ে ড্রপ দিতে দিলেন। তার নজরে কি পড়েনি—ড্রপ এ্যালাউ করলেই গোলকিপারের হাতে যাবে? মনে রাখা উচিত, খেলায় সুযোগের সদ্ব্যবহারই সুযোগ সন্ধানী খেলোয়াড়ের পরিচয়। তবেই তো জেতা যায়।

ইস্টবেঙ্গল যে গোলটা খেল, তা দেখে মনে হয়েছে সামগ্রিকভাবে এখনও ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স ব্যালান্স হয়নি। ব্যালান্স ঠিক এই ভাবেই হয়—গোলকিপারকে ব্যাকপাস দিতে হলে কখনও বলকে দুই পোস্টের মধ্যে দিতে নেই। দুই পোস্টের সাইডে দিতে হয়। হোক না কর্নার। চরম বিপদ তো আসবে না—এটাই হল ফুটবল কনভেনশান। এ মানতে হবে। আরেকটি কথা আছে। সেটা হল 'গো ফর দ্য বল'। ব্যাকপাস হয়েছে, গোলকিপার দাঁড়িয়ে থাকবে বা বলের অপেক্ষা করবে কেন? বলের দিকে যেতেই হবে। আবার বলের মুখ যখন গোলকিপারের দিকে ও উইংব্যাক ব্যাকপাস দিচ্ছে, তখন বাকি তিন ব্যাকের কাজ কি? ডায়গোনাল হওয়া নয় কি? সেই মুহূর্তে কোথায় ছিল মনোরঞ্জন, গুরদেব ও সত্যজিত। মানস একা ফাঁকায় এক কি করে? আশা করি তারা নিজেরাই এই ভুল সংশোধন করে নেবে।

খেলার শেষের দিকে একটু আধটু দুই দলের খেলোয়াড়গণ অধৈর্য হয়ে ফাউল করছিল ও চড়া মেজাজের দিকে যাচ্ছিল। তবে ডেভিডকেও দেখেছি নিজের ভুল বুঝে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে ও স্পোর্টসম্যানের পরিচয় দিতে। আজকের খেলা কোন সময়ই উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে পৌছয়নি। তবে মনে থাকবে আজকের দিনে বড় ক্লাবের খেলোয়াড়ও হাত জোড় করে ক্ষমা চায় ও ডেভিড উইলিয়মস সে স্পোর্টসম্যানের নিদর্শন রেখে গেলেন এবং খেলার শেষে সবাইকে ভাই ভাই করে নিলেন। সেই সুবাদে আমি তাকে অভিনন্দন জানাই।

ইস্টবেঙ্গল: ভাস্কর গাঙ্গুলি, চিন্ময় চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরদেব সিং ও সত্যজিত মিত্র, প্রশান্ত ব্যানার্জি ও দেবরাজ, সুরজিত সেনগুপ্ত (সুভাষ ভৌমিক), মিহির বসু, সাবির আলি ও ডেভিড উইলিয়মস।

মোহনবাগান: প্রতাপ ঘোষ, শ্যামল ব্যানার্জি (কম্পটন দত্ত), সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ও দিলীপ পালিত, গৌতম সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, জেভিয়ার পায়াস (রঞ্জিত মুখার্জি), শ্যাম থাপা ও বিদেশ বসু।

রেফারি: সুধীন চ্যাটার্জি। ●

সাত জুলাই মাঠের মধ্যে পি কে

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: চারটে পাঁচ নাগাদ ইস্টবেঙ্গল মাঠে এলে তুমুল উল্লাসে সমর্থকরা ফেটে পড়েন। তার ঠিক তিন মিনিট পর, অর্থাৎ চারটে আটে মোহনবাগান মাঠে প্রবেশ করার পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রদীপ ব্যানার্জি এলেন। আজ তাকে স্পষ্টতই অন্যাদিনের মত সহজ লাগছিল না। প্রতিদিন যা করেন, এদিনও সেই লাইনের ধারে এসে দাঁড়ালেন। গায়ে সেই নীল সার্ট, পায়ে সোয়েড-শু। ফেন্সিংয়ের ভিতরে অত্যন্ত ভিড়, লোক ঢুকে পড়েছেন বেশী। তারই মধ্যে বিদ্যুৎ মজুমদারের বাঁ পাশে বসে পড়লাম। লিগ উৎসবের মহাপূজার প্রাক-মুহূর্তে সারা মাঠ গমগম করছে। বাঁদিকে মোহনবাগানের বাকি প্লেয়াররা সার দিয়ে বসে আছে—মোহন ছেত্রী, উলাগানাথন, সমর ভট্টাচার্য, কম্পটন, শিবাজী, রঞ্জিত, স্বপন নন্দীরা।

ইস্টবেঙ্গল : মোহনবাগান— সাইড লাইনে বসে কেষ্ট মিত্র, মোহন ছেত্রি, তপন দাস ও শ্যামল ব্যানার্জি/শংকর



ওদের মাঝে মোহনবাগানের প্রাক্তন গোলরক্ষক প্রশান্ত মিত্র। বিদেশকেও ডেকে কোচ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিলেন।

রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। নিজের ঘড়ির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ পি কে-রও। পুরো মাঠটা অধীর প্রতীক্ষায়। সাইড লাইনের ধারে বসা কাউকে কাউকে কপালে হাত ঠুকতেও দেখলাম। কাটায় কাটায় চারটে পনেরোয় সুধীনের মুখের হুইসল বাজল। শুরু মহারণ। এবং প্রদীপ ব্যানার্জি ঘড়ির দিকে ফাইনাল তাকিয়ে বসে পড়লেন—চুপ করে, হাঁটু মুড়ে, আমার থেকে গজ দশেক ডানদিকে।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে—রাজ্য জয়ের জন্য নয়—মাঠ দখলের, বল আয়ত্তে রাখার এবং জালে বল পাঠাবার জন্য। প্রদীপ ধীরে ধীরে চঞ্চল হচ্ছেন। খেলা শুরুর মিনিট কয়েকের মধ্যে সুব্রত হেডে ফ্ল্যাইট মিস করল। ফাঁকায় সাবিরের পায়ে বল। চলতি বলে সট বেরল সাবিরের পা থেকে। প্রতাপ ঘোষ ডানদিকে শরীর হেলিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল বল। অনেকটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন পি কে। চিৎকার করে উঠলেন—বাবলু! বাঁদিকে ঘুরে একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এভরি ডে ওভার কনফিডেন্সের বশবর্তী হয়ে ও একই জিনিস করছে। পরমুহূর্তেই মাঠের দিকে ঘুরে তাকিয়ে—ও কে, বাবলু চালিয়ে যা।

ইস্টবেঙ্গল আক্রমণকারীর ভূমিকায়, প্রদীপ ব্যানার্জির কপালে চিন্তার কুঞ্চন রেখা। উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন। এমন সময় সবার চোখ পড়ল প্রদীপ চৌধুরীর দিকে। ওর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। কালবিলম্ব না করে পি কে আবার উঠে পড়লেন লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে চৌধুরীকে বললেন, কণ্টিনিউ কর্। চৌধুরী তাই করতে লাগল। কিন্তু ওর কপালের রক্ত পড়া তখনো থামছে না। অনেকে একসঙ্গে ওকে উঠে আসতে বললেন। প্রদীপ চৌধুরীর কিন্তু তখনও ভাবলেশহীন মুখ। এবার পি কেও ওকে দ্রুত ডাকলেন—চলে আয়। প্রদীপ চৌধুরী চলে এল। ততক্ষণে ফাস্ট এড-এর লোকদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। পি কে অনেকটা হাহাকার করলেন—তোর কপাল রে! চৌধুরী বলে চলেছে—ব্যাণ্ডেজটা হাল্কা করে বাঁধুন প্রদীপদা, আমায় খেলতে হবে। বাঁধা শেষ হল। ডিফেন্স করতে মাঠে ফিরে গেল প্রদীপ চৌধুরী।

ম্যাচ এগোচ্ছে। —'ওরা অনেক কম্বাইন্ড ফুটবল খেলছে'—বিদ্যুৎ মজুমদারের মন্তব্য। কথাটা সত্যি। তখন খেলার মিনিট সতের কেটেছে। ইস্টবেঙ্গল গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। গোলের ছয় গজের মধ্যে সুব্রত হেড করতে পারল না। পারল সাবির। বল জালে। মাঠের অর্ধেকাংশ আনন্দে লাফাচ্ছে। ছিটকে উঠে পড়লেন পি কে— কি করলি বাবলু! বলটা হেড করতে পারলি না!'.

খেলা ততক্ষণে আবার শুরু হয়ে গেছে। পি কে গলা চড়ালেন—ওরে চল, চল! একটু বাদেই শ্যামল ব্যানার্জির থাই মাস্‌লে পেন হল। শ্যামলের আবার থাই বিগড়েছে, এই কম্পটন, রেডি হও। বসে থাকা খেলোয়াড়দের মাঝে দাঁড়িয়ে কোচ কম্পটনকে নির্দেশ দিলেন। তড়িৎ গতিতে কম্পটন উঠে দাঁড়াল, মাঠে নামল। থাই ঘষতে ঘষতে শ্যামল ফিরে এল, 'কাওয়ার্ড কোথাকার। ভিতুর দল' – পাগলের মত তিনি শ্যামলকে বকে উঠলেন। অতঃপর না থেমে তিনি বলে চললেন—'কাম অন সুব্রত, ওঠ, চল, খেলো, বিদেশকে হেল্প কর। সুব্রত, চৌধুরী এগোও, গৌতম ধরো।'

ডেভিড উইলিয়ামসের পায়ে বল। চমৎকার টেনে এনে গোলার মত সট করল ডেভিড দ্বিতীয় পোস্ট ঘেঁষে। মনে হল নিশ্চিত গোল। পি কে বোধহয় শিউরেও উঠলেন। কিন্তু অনবদ্য ক্ষিপ্রতায় প্রতাপ সে বল বাঁচাল। চিৎকার করে উঠলেন কোচ পাশে ফিরে—'দ্যাখ, কিভাবে আটকে যাচ্ছে প্রতাপ। ওই তো ম্যাচ সেফ করছে রে! কি গোল বাঁচাল!'

মোহনবাগান কর্নার পেল। কোচ আবার উঠে দাঁড়ালেন। প্রদীপ আজ খানিকক্ষণের জন্যও স্থির হয়ে বসতে পারছেন না, মাঝে মাঝেই তাকে উঠে পড়তে হচ্ছে। বিদ্যুৎবাবুর গলা শোনা গেল—দিলীপ ডাউনে (নেমে) আয়।

প্রথমার্ধ শেষ হতে আর বিশেষ বাকী নেই। এমন সময় গোল শোধ করল মোহনবাগান, মানসের দ্বারা। চিন্ময়ের ভুল মোহনবাগানকে এই সুযোগ এনে দিয়েছে। অতএব, এই মুহূর্তে উল্লাস ভেসে এল মোহন সমর্থকদের কণ্ঠ থেকে। কোচের চোখে-মুখে কিছুটা স্বস্তির প্রলেপ পড়ল। গর্জন করে উঠলেন তিনি—দিলীপ কাম্ অন। পরিষ্কার বোঝা গেল পি কে-র মনে শক্তি ফিরে এসেছে। হাফ টাইম।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হল পাঁচটায়। একইভাবে ঘড়ির দিকে তাকালেন, হাঁটু মুড়ে বসলেন, একটু বিড়বিড় করলেন। মাঝে মধ্যেই রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নিচ্ছেন তিনি। সেকেণ্ড হাফে রঞ্জিত নেমেছে পায়াসের জায়গায়। এবার তিনি শুরু করলেন রঞ্জিতকে দিয়েই—'এগিয়ে এসো রঞ্জিত। বিদেশ!'—চিৎকার, ঝংকার তুলল। 'মানস, এই ভাবে ছোট'—তিনি বললেন। প্রশিক্ষককে উদ্দেশ্য করে মানসের গলা শোনা গেল, সেই-বল পাচ্ছি না, প্রদীপদা। কোচের সংলাপে—'দেবে, দেবে। তুমি দৌড়োও, নিজে রেডি থাকো'।

এরপর রিলে করার ভঙ্গিতে পি কে-র গলা ওঠা-নামা করতে লাগল, 'এই রঞ্জিত—কি করছিস, বল ছাড়ো। গোপাল (প্রসূন) লেট করো না, রঞ্জিত সময় ফুরিয়ে আসছে, চলো। ওরা করছেটা কি?'

মুহূর্ত খানেকের মধ্যেই আবার তিনি ম্যাচের মধ্যে ইনভলভড্ হয়ে গেলেন, এই মানস, যাও না, দাঁড়িয়ে পড়ছো কেন? আরে, বিপক্ষের একটা লোক (প্লেয়ার) আছে, কেউ দেখছো না।

লড়াই শেষ হয়ে আসছে। পরিণতি ঝুঁকে পড়ছে ড্র-য়ের দিকে। সুব্রতকে লক্ষ্য করে বাক্যও চালালেন, আঙুলও নাড়লেন, বাবলু বক্সে চলে আয়। বাবলু অবশ্য রিস্ক নেয়নি। খেলা শেষ। জয় বা পরাজয়—কারোরই ঘটল না। ম্যাচ ১—১। খেলোয়াড়রা ড্রেসিংরুমের দিকে পা বাড়াল, কোচও। ●

টেন্টে ও মাঠের মাঝে অরুণ ঘোষ



কোচ অরুণ ঘোষ কি চান ?: দ্বিতীয়ার্ধে সুভাষ ভৌমিক মাঠে নামার অপেক্ষায়/শঙ্কর

সন্দীপ দত্ত ঃ অরুণ ঘোষ ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর প্লেয়ার্স রুমে যখন কাগজটি হাতে নিয়ে ঢুকলেন তখন কাঁটায় কাঁটায় তিনটে। অরুণ ঘোষের সঙ্গে ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহা ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে তখন একধারে শান্ত মিত্র, প্রশান্ত সিংহ ও আরও অনেকে। প্লেয়ার্স রুমে ঢোকার অনুমতি কেউ পাননি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শঙ্কর। কি আর করা যায়। ওকেই প্রশ্ন করলাম ঘরের মধ্যে কি ব্যাপার হচ্ছে ! দরজা বন্ধ কেন ? শঙ্কর; মনে হল একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দলে কারা রয়েছে তাদের নাম জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর কি হচ্ছে ? শঙ্কর এবার বলল—কোচ প্লেয়ারদের সঙ্গে কথা বলছেন কেমন করে খেলতে হবে।

বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক তিনটে বেজে পঞ্চান্ন মিনিট। দরজা খুলে গেল এবার। দেখলাম ছাই রং-এর সার্ট নেভি ব্লু প্যান্ট, চোখে গগলস পরে অরুণ ঘোষ সকলকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন। গেটের বাইরে পাঁচটা গাড়িতে ঠাসাঠাসি না করে প্লেয়াররা সব উঠে গেল একে একে।

মাঠে পৌঁছে দেখি ইস্টবেঙ্গল আগে নামবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবর অন্যরকম ছিল, কাজেই একটু অবাক হলাম। ভিড় ঠেলে অরুণ ঘোষের কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিলাম। দেখলাম অরুণ ঘোষ হাত-ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন। তারপর সূর্য প্রণাম পশ্চিম দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে। মনে হল শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। অরুণ ঘোষ সিগারেট ধরালেন। পাশে বসে পরেশ সাহা। টিম মাঠে নেমে গিয়েছে এর আগে।

চারটে বেজে ১৫ মিনিট। খেলা শুরু হল। অরুণ ঘোষ আবার ঘড়ি দেখলেন, সূর্য প্রণাম। সাবিরের প্রথম সুযোগ নষ্ট হতেই মনে হল অরুণ ঘোষ একটু নড়ে চড়ে বসলেন। মুখে অবশ্য কোন উত্তেজনার ছায়া নেই। আবার মিস সাবিরের। অরুণ ঘোষ মনে হল পাথর হয়ে গেছেন। তারপরই সাবিরের মাথা ছুঁয়ে গোল। অনেকে ছুটে এলেন অভিনন্দন নিয়ে। অরুণ ঘোষ কিছুটা সহজ হয়েছেন। এরপর ডেভিডের দুর্দান্ত সটে গোল হল না। অরুণ ঘোষ চুপ রইলেন। শুধু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মোহনবাগানের গোলের দিকে দেখলেন।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। বারবার ভাল সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। তারপর চিন্ময়ের ভুল, মানসের ছুটে আসা। গোল শোধ। মুহূর্তের জন্য শান্ত মানুষ অরুণ ঘোষ নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। হাত চলে গেল মাথার চুলে। মনে হল ছিঁড়ে ফেলতে চাইছেন হতাশায়। ঘটনার আকস্মিকতায়। রিলিফ চাইলেন একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে। বিরতির সময় দল নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন আবার দল নিয়ে।

খেলা শুরু হল আবার। মোহনবাগান হারা ম্যাচ আবার হাতে পেয়েছে। মাঝে মাঝে বক্সের মধ্যে ঢুকছে। দ্বিতীয়ার্ধে মোহন-বাগান গোলের সামনে একটা জটলা হয়েছিল। কিন্তু অরুণ ঘোষ আর গোল আশা করেননি। শুধু পরেশ সাহার সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বললেন। সুভাষ ভৌমিক বুট পরে বসে আছেন। অরুণ ঘোষ সুরজিতকে ডেকে নিলেন। সুরজিতের জায়গায় সুভাষ।

খেলা ভেঙে গেল। অরুণ ঘোষ ঘড়ির দিকে তাকালেন। আবার সূর্য প্রণাম। অরুণ ঘোষ মাঠে ঢুকে সকলের মধ্যে মুহূর্তের জন্য গিয়ে দাঁড়ালেন।

সাত জুলাই—একটি মোহনবাগানী ভাষ্য

সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় ঃ মাঠে গিয়েছিলাম— যদিও লিখেছিলাম যাব না। গেলাম কারণ সারা শহরে আশঙ্কা ছিল গোলমাল হবে—দারুণ গোলমাল। এদিকে পুত্র যাবেই। আমি বাড়িতে বসে ও যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ ভাবব। তার চাইতে সঙ্গেই গেলাম। একটা উত্তেজনা থামানোর বড়ি, একটি মাথা ধরার ওষুধ এবং লীলা মজুমদারের গ্রন্থাবলী নিয়ে হাজির হলাম মাঠে তখনও ১-৩০ বাজেনি। কথা ছিল দুটোয় দরজা খুলবে। আমরা কিন্তু তার আগেই ঢুকলাম। আমরা যখন ঢুকেছি তখন মাঠ প্রায় ফাঁকা। তাই বলে সবচেয়ে ভাল সিটগুলোয় কিন্তু আমরা বসতে পারব না। কারণ ওগুলি 'রিজার্ভ' আছে। কারা এই আসন সংরক্ষণ করে জানিনা। এরা মোহনবাগানের বিশেষ ধরনের অসভ্য। এদের নিজেদের কার্ড বেশীর ভাগেরই নেই, তবে নিশ্চয় শাঁসালো দাদা আছে। সুতরাং ওখানে বসলে লাঞ্ছিত হবেনই। পুলিশের সামনে হলেও হেরফের হবে না। পুলিশ গোলমালে যেতে চায় না। ক্লাব কর্তৃপক্ষর এরা নিশ্চয় স্নেহপুষ্ট। অকথ্য গালিগালাজ এদের মুখের লবজ। শুনেছি ইস্টবেঙ্গলেও একই ব্যাপার। কে বলে আমাদের মধ্যে ঝগড়া !

খেলা আরম্ভ হবার আগে অনেক কাণ্ড হল। মতি নন্দী, চুনী গোস্বামী, যতীন চক্রবর্তী সবাই এলেন। সম্বর্ধনা পেলেন। একজন যতীন চক্রবর্তীর কাছে ফ্ল্যাট চাইল। এদিন মাঠে দুই-এর জয়জয়কার। শুনলাম দুগোলে জিতবে মোহনবাগান—দুজন জ্যোতিষী বলেছে। দুটো পাঁঠা বলি দেওয়া হবে কালিঘাটে। দু পয়সা করে পয়েণ্ট ফিস্ খেলা চলছিল মাঠের মধ্যে। যারা করিতকর্মা তারা প্রত্যেকের কাছ থেকে মেম্বারশিপ কার্ড সংগ্রহ করে বেরিয়ে গেল। অন্যরা আসবে। একেক কার্ডে দুজন করে। কে বলে বাঙালীর ব্যবসা বুদ্ধি নেই। ফলে মেম্বারশিপ গ্যালারিতে তিল ধারনের জায়গা ছিল কিন্তু মনুষ্য ধারনের ব্যাপারে তার ভারতের মতো অবস্থা। আমি ওর মধ্যেই মনটাকে শান্ত করবার জন্য লীলা মজুমদারের গুপীর গুপ্তখাতা পড়তে লাগলাম। মাঝে মাঝেই লোকজন যাতায়াত করতে লাগল। মোটা মানুষ বলে অনেকে সরবে, আরো অনেকে নীরবে গাল পাড়ল।

পুলিশের ব্যবস্থা অন্যদিকে ভাল ছিল। মোহনবাগান দলের সদস্যরা বরাবরই সরকার ভুক্ত সুতরাং মোহনবাগানের নিশান বেশী আসেনি। ইস্টবেঙ্গল বরাবরই তেড়িয়া সুতরাং বড় বড় নিশানে ভর্তি ছিল তাদের দিক। মোহনবাগানেরও একটা মাঝারি নিশান ছিল কিন্তু তাতে দক্ষিণ দিকের গোল পোস্টটা দেখা যাচ্ছিল না। তাই সরানো হল।

টিম মাঠে নামল। প্রথমে ইস্টবেঙ্গল। পরে মোহনবাগান। আবার মন খুঁতখুঁত করলো। ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকছে না। তখনো আমার কপালে দুর্ভোগ বাকি ছিল। যে খেলা মোহনবাগানের খেলার কথা সেই খেলা কিনা খেলল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমে জোরসে আক্রমণ। কি তেজ, কি ধার। এই টিমটা নাকি সারা বছর খুঁড়িয়ে খেলছিল ! তারপরই বজ্রাঘাত। আমাদের সুব্রত, যার ওপর আমাদের যেমনি ভালবাসা তেমনি বিশ্বাস। সে কিনা ডোবাচ্ছে ! আহা, প্রতাপ কি শটটাই না বুখলো ! আমরা ওই সুযোগ পেলে নিশ্চয় গোল দিতাম। ভাবলাম একটা ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না। কিন্তু আবার সেই কাণ্ড। তারপর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। সাবির আলিকে সুব্রত আটকাতে পারল না। মাথা দিয়ে বল ঘুরিয়ে দিল একদম ডান দিকের জালে। আমার কেমন মনে হয়েছিল রেফারি হয় অফসাইড কিম্বা ফাউল দেবেন। কিন্তু ততক্ষণে পাশবিক চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দিক একদম চুপ। কলকাতার কোন উঁচু বাড়ি থেকে যেমন দেখা যায় একটা অংশে আলো অন্যদিকে অন্ধকার। সেইরকম একটা দিকে চিৎকার, অন্যদিকে নিস্তব্ধতা। আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের ভাষায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা। ওরই মধ্যে একবার পিছন ফিরে দেখলাম 'খেলার আসর' সম্পাদক খুশী খুশী ভাবে বসে আছেন। মতি নন্দী গুম হয়ে বসে আছেন। পুষ্পেন সরকার খুশী। কিন্তু ওসব খুঁটিয়ে দেখব কখন। ইস্টবেঙ্গল চুটিয়ে খেলছে।

শনিবারের ছড়রা

নিতাই ঘোষ

তোড়-জোড়টা সকাল থেকে
চলছেরে ভাই সব পাড়ায়,
বিকেল বেলা খেলা হবে
কে হারাবে ! কে হারায় ?
পাড়ায় পাড়ায় উড়ছে নিশান
নৌকো নয়তো মশালের,
দু-দলেরই সবাই ভাবে
লিগ্ জিতব এ-সালের।
দুম্ দুমাদুম্, পটকা ফাটে
কাঁপছে পাড়া আওয়াজে,
কানের মধ্যে পর্দা ছেঁড়ে
হিন্দি গানের রেওয়াজে।
খেলা যখন শুরু হল
উত্তেজনায় সব পাগল,
একপক্ষ থমকে দাঁড়ায়
হল যখন একটা গোল।
দু-দলেরই গোল হয়েছে
মাঠের মধ্যে হাহাকার
লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন
মিলে মিশে একাকার।



অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় 'ওলিম্পিকের গপ্পো' প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক

বল যেন ওদের পায়ে আঠার মতন আটকে গেছে। আর খেলছে প্রতাপ ঘোষ। আজকে সে রাণা প্রতাপ। মিহির সাবির ডেভিড কেউই তাকে পেরোতে পারছে না। আজ প্রতাপ ওই খেলা না খেললে ৩—০ হয়ে যেত কিছু বোঝার আগে।

তবে গেরস্তেরও দিন আসে। আজকের সেরা গোলটা দিল মানস। মানস যেভাবে ছুটে এসে বল ধরল, যেভাবে কাটাল ভাস্করকে আর মনোরঞ্জনকে তারপর মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলটা জালে ঠেলে দিল তা প্রায় কবিতার মত। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মোহনবাগান এরকম ভাবে গোল দেয় না। অথচ মানস দিল। আসছে বার কি ও থাকবে আমাদের ক্লাবে? এসব ভাববার সময় ছিল না। পাশে ছেলে চেঁচাচ্ছিল আরেক পাশে নবীন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। আর সাংঘাতিক পেছনের একটি ছেলে আমাকে আমগাছ মনে করে আমার মাথায় চড়বার চেষ্টা করছিল। মোটা হবার অনেক দুঃখ কিন্তু এইসব শাখা-মৃগদের অত্যাচার সহ্য করতে হলে রোগা পাতলারা কিচ্ছু করতে পারবে না। জমজমাট প্রথমার্ধ শেষ হল। আমি এর আগেই সেই মাথা ঠাণ্ডা করবার বড়িটা খেয়ে নিয়েছি। বুকের মধ্যে হাতুড়ি, দুরমুশ, বুলডোজার সব একসঙ্গে চলছিল যে।

প্রথমার্ধ যদি ইস্টবেঙ্গল বনাম প্রতাপ ঘোষ হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ার্ধ হল মোহনবাগান বনাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বড় ভাল খেলে এই ছেলেটি। ওর খেলা আরো ভাল হোক। গুরুদেবের চেয়ে মনোরঞ্জন ভাল। পায়াসের চেয়ে রঞ্জিৎ ভাল, ডেভিডের চেয়ে মানস ভাল, আর সবার চেয়ে ভাল প্রতাপ ঘোষ। প্রতাপকে আজকে নিশ্চয় আটফুট লম্বা লাগছে। গতকাল যে অখ্যাত আজ সে সুপার স্টার। আমরা এই তারকার জন্ম দেখলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সুব্রত চিমেতাল হয়ে গেছে, দেখলাম সুরজিত শেষ পর্যন্ত খেলতে পারল না। মনটা খারাপ লাগলো। কিন্তু লিগ জমে গেছে। প্রত্যেকটা পয়েন্ট এখন মূল্যবান। আর মহমেডান হঠাৎ আবার দৌড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

দু বছর আগে গৌহাটিতে বরদলুই ট্রফি মোহনবাগান জেতার পর আমি আমার এক অসমীয়া বন্ধুকে বুঝিয়েছিলাম, আমাদের কাছে লিগ শিল্ড, ডুরাণ্ড রোভার্স সব মায়া। সত্য শুধু ইস্টবেঙ্গল। তাদের যদি হারাতে পারি তাহলেই আমরা খুশী। ট্রফি চুলোয় যাক। সে খুশীটা হল না। কিন্তু প্রতাপ না থাকলে যে দুঃখটা হত সেটাও নেই। এখন থেকে শিল্ডের জন্য বসে থাকবো, দেখি তখন ওদের হারাতে পারি কিনা। ইস্টবেঙ্গলকে না

সাবিরের গোল—ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উল্লাস /পাহাড়ী



হারিয়ে লিগ পাওয়া আলুনি লাগবে।

খেলার শেষে যখন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক মোহনবাগান সমর্থকরা একসঙ্গে আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলুম, তখন শুনলাম ফল নাকি আগেই ঠিক ছিল। ওরা নিশ্চয় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে চেনে না, তা নাহলে এ ধরনের কথা বলত না। হারাতে পারলে আমরা ছেড়ে দিতাম না। পারি না। ইস্টবেঙ্গল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

আজকের হিরো দুজন। প্রতাপ ঘোষ আর দর্শকরা। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা প্রতাপকে ঢিল মারবার পরও বলবো গ্যালারির স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার গ্যালারিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ আর আমার ইলিশ মাছ কিনতে হয়নি। ●

এদের চোখে

প্রশান্ত সরখেল

প্রথম হাফে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা কোনও সময়েই গুছিয়ে খেলতে পারেনি, বিশেষ করে দুই হাফ ও স্টপারদের আড়ষ্ট খেলার ফাঁকে ইস্টবেঙ্গল পরিকল্পিত ফুটবল খেলেছে। এবং গোলটিও হয়েছে ডিফেণ্ডারদের ভুলেই। তবে ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ডরা আর একটু তৎপর হলে আরও গোল অবশ্যই হত। মানসের করা গোলটি দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে।

বিনু চ্যাটার্জি

গোড়াতেই মোহনবাগান খেলোয়াড়দের আড়ষ্ট খেলার পুরো ফায়দা উঠিয়ে ইস্টবেঙ্গল বিপক্ষ সীমানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলে যে কটি সুযোগ পেয়েছিল তা থেকে তিনটি গোল অবশ্যই হতে পারত। প্রথম হাফে ৩–০ এগিয়ে গেলে খেলার ফল কি হত এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মোহনবাগান গোলকিপার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ। (মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল) খেলতে নেমে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে। যে গোলটি খেয়েছে সেটি ঠিক সময়মত গোল ছেড়ে বেরিয়ে পাঞ্চ করে দিলে গোল না হতেও পারত। কারণ স্পট থেকে গোল পোস্টের দূরত্ব ছিল ছ' গজের মত। দ্বিতীয় হাফের শুরুতেই মোহনবাগানের দুই হাফ বিশেষ করে গৌতম রক্ষণ ও আক্রমণে সমানভাবে মদত দেওয়ায় মোহনবাগানের খেলায় অনেক উন্নতি হয়। সমতা ফিরে আসার পর দু পক্ষের খেলোয়াড়রা গঠনমূলক খেলার ঝুঁকি না নেওয়ায় দর্শকের মন ভরেনি।

প্রশান্ত সিংহ

প্রথম হাফে ইস্টবেঙ্গল খুবই ভাল খেলেছে। প্রথম ৩৫ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল যে কটি সুযোগ পেয়েছিল হাল আমলে সারা



থঙ্গরাজ—ভাস্কর গোল ছেড়ে ওভাবে এগিয়ে এল কেন/পাহাড়ী

ম্যাচে এত সুযোগ ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান তৈরী করতে পেরেছে বলে মনে পড়ে না। গোলে সট হয়েছে প্রচুর। তবে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে প্রতাপ বিশ্বস্ত হাতে বল ধরে ডেভিড ও সাবিরকে গোল পেতে দেয়নি। তুলনায় এই সময় মোহনবাগানের ভূমিকা ছিল অনেক ম্লান! তবে বিরতির পর মোহনবাগানে খেলায় বোঝাপড়া অনেক ভাল ছিল। গোলে প্রতাপ, স্টপার প্রদীপ ও লিংকম্যান গৌতমের খেলা তারিফের। অন্যদিকে এক গোলে এগিয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল বিরতির পর কেমন যেন গুটিয়ে যায়। মানসের গোল শোধের কৃতিত্বকে খাটো না করে বলা যায় প্রায় হাফ লাইন থেকে চিন্ময়ের মত ডিফেণ্ডার বল সাইড লাইনের বাইরে না পাঠিয়ে যে ব্যাক পাস করেছে তা যে কোন গোলকিপারের ধারনার বাইরে। তবে ডিফেন্সে মনোরঞ্জন এবং আক্রমণভাগে ডেভিড ও সাবিরের খেলা ভাল হয়েছে। এছাড়া দেবরাজের বল দিয়ে নিয়ে খেলা চোখে পড়েছে। খেলার ফল ১—১ হয়ে যাওয়ার পর দুপক্ষের খেলোয়াড়রা কনস্ট্রাকটিভ ফুটবল খেলার দায়িত্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখায় খেলার আকর্ষণ কমে যায়।

পরিমল দে

প্রথম হাফের খেলার ধারা অনুযায়ী খুব সঙ্গত কারণেই ইস্টবেঙ্গলের ৩—০ ম্যাচ জেতা অসম্ভব ছিল না। সাবির একটি গোল করা ছাড়া হেডিংয়ে যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়েছে। তবে ৫ মিনিটে সাবির আরও একটি গোল পেতে পারত। শেষ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রেস করলে গোল হত। দ্বিতীয় হাফে মোহনবাগান অনেক ভাল খেলেছে। মানস সারা খেলায় আহামরি কিছু না করতে পারলেও দলের প্রয়োজনে একটি দর্শনীয় গোল করে সকলের প্রশংসা আদায় করেছে। দু'দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন, সাবির, ডেভিড এবং মোহনবাগানের গৌতম, প্রদীপ ও প্রতাপের খেলা ভাল লেগেছে। তবে হাফ লাইনের কাছ থেকে চিন্ময়ের ব্যাক পাস করার কোন অর্থ খুঁজে পাইনি। দু'দলের নামী-দামী খেলোয়াড়দের খেলা দর্শকদের মনে দাগ কাটতে না পারলেও এই খেলাকে ঘিরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিক থেকে বিচার করলে খেলার ফল খুব ভাল হয়েছে।

অশোক চ্যাটার্জি

টি ভি-তে খেলা দেখে বিশেষ কিছু বলা মুস্কিল তবে প্রথম হাফে ইস্টবেঙ্গলের দুরন্ত আক্রমণে মোহনবাগান রক্ষণে মাঝে মাঝে থরহরি এনে যে কটি সুযোগ পেয়েছিল সেগুলি ঠিক ঠিক ব্যবহার হলে খেলার ফল ৩—১ হওয়া উচিত। ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের মুখে মোহনবাগান গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষের দৃঢ়তা অবশ্যই প্রশংসার। ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা মোহনবাগানের দুই হাফ গৌতম ও প্রসূনের ব্যর্থতায় প্রথম হাফে জাঁকিয়ে খেলতে পেরেছিল। যা সম্ভব হয়নি দ্বিতীয় হাফে গৌতম ও প্রসূন নিজেদের খেলা ফিরে পাওয়ায়। তুলনায় চার হাফের সবচেয়ে বেশী সফল ছিল ইস্টবেঙ্গলের রাইট হাফ দেবরাজ। ইস্টবেঙ্গলের স্টপার মনোরঞ্জনের লড়িয়ে খেলা ভাল লেগেছে। সত্যজিতের চেষ্টা ছিল ভাল খেলার। দুটি গোলের মধ্যে মানসের গোলটি সত্যিই তারিফ করার। মোহনবাগান গোলে প্রতাপ সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। খেলার মান কখনওই উঁচু পর্যায়ে পৌঁছোতে পারেনি।

প্রণব গাঙ্গুলি

মাঠে বসে সব চেয়ে খারাপ লেগেছে দু-দলের খেলোয়াড়দের কর্নার ও ফ্রি-কিকের এলোপাথাড়ি ব্যবহার। এইগুলি থেকে গোল হওয়ার চান্স শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ। সাবির একটি গোল পেয়েছে ঠিকই কিন্তু সে যে সুযোগ নষ্ট করেছে সেরকম সুযোগ বড় খেলায় খুব কমই আসে। তবে দিনের সেরা গোল মানসের। চিন্ময়ের ব্যাক পাস ফলো করে রাইট আউট থেকে ছুটে এসে যেভাবে গোল করেছে তাতে ওর সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ডেভিডের খেলা বেশ ভাল লেগেছে। প্রথম হাফে ওর শট থেকে গোল পাওয়া উচিত ছিল। অবশ্য প্রতাপ খুব ভাল বাঁচিয়েছে। খেলার ফল একবিন্দুতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর দু'দলই

গুটিয়ে যাওয়ায় খেলায় নিখুঁত আক্রমণ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

শম্ভু দাস চৌধুরী

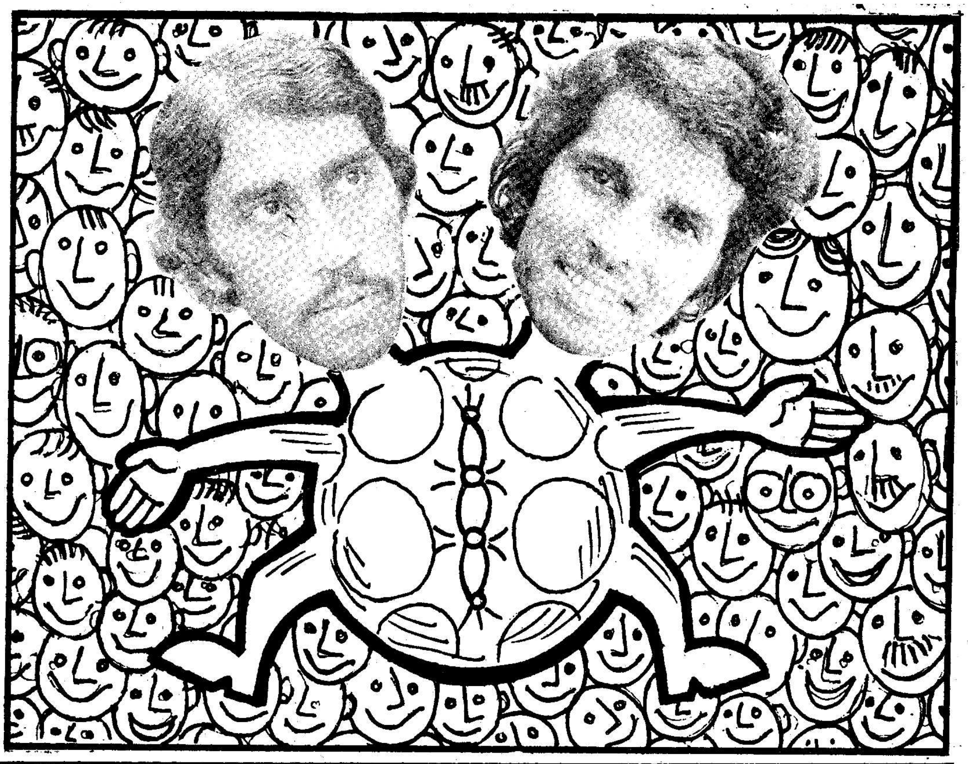
টেলিভিশনে খেলা দেখেছি। ইস্টবেঙ্গলের শুরুটা বেশ জোরদার ছিল। যে কটি সুযোগ পেয়েছিল তা থেকে অন্তত তিনটি গোল পাওয়ার কথা। বিশেষ করে সাবির ও ডেভিডের গোল দুটি পেলে খেলার ফল অন্যরকম হত। দু'দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের ডেভিড, দেবরাজ ও মনোরঞ্জের খেলা বেশী চোখে পড়েছে। দ্বিতীয় হাফে মোহনবাগানের গৌতম ও প্রসূন মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ধার অনেক কমে গিয়েছিল। বিদেশের গতিসম্পন্ন খেলা ছেড়ে নীচে নেমে খেলায় চিন্ময় বাড়তি সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের গোল খাওয়ার পেছনে সব চেয়ে বড় দোষ চিন্ময়ের। শেষ দিকে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান কারও কনস্ট্রাকটিভ খেলায় মন ছিল না।

[সাক্ষাৎকার সন্দীপ দত্ত]

মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল
শেষ অমীমাংসিত খেলা :

১৯৭১ লিগ ম্যাচে :

ইস্টবেঙ্গল—১ : মোহনবাগান—১
(শান্ত মিত্র) (কান্নান)



সাত জুলাইয়ের রেফারি

স্বপন ঘোষ : খেলা আরম্ভের ঠিক মিনিট পনের আগে রেফারি জানতে পারেন কে বাঁশী বাজাবে। শেষ সময়ে রেফারি নির্বাচনে এদের মনের ভেতর একটা বাড়তি চাপ পড়ে। বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলায় রেফারি পোস্টিং হয় তিন মাস আগে। আগে নির্বাচন করলে যারা খেলা পরিচালনা করেন তারা একটু বাড়তি সুযোগ সুবিধা পাবেন, অনেকে মনে করেন বড় ম্যাচের আগে খেলোয়াড়রা যেমন টেনসনে ভোগেন, তার থেকে কিছু কম টেনসনে থাকেন না রেফারিরা।

৭ জুলাই সকাল এগারটা পাঁচ মিনিট। সি আর এ টেন্টের চতুর্দিক জনমানব শূন্য। ঢুকতেই ব্লাক বোর্ডে লেখা চোখে পড়ল দিনের ফুটবল প্রথম ডিভিসন মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল। তৃতীয় ডিভিসনের খেলা কালীঘাট মিলন সমিতি বনাম ইন্টার ন্যাশনাল ক্লাব। নোটিশ বোর্ডে সি আর এ কর্তৃপক্ষের দেওয়া নির্দেশনামা ঝুলছে, হাজির থাকার জন্য যাদের নাম তারা : সুধীন চ্যাটার্জি দিলীপ সেন, তারক সেন, সুনীল অধিকারী জগদীশ পাল এবং সুখেন্দু শেখর গুপ্ত।

এগারটা বেজে বিশ মিনিট। প্রথম টেন্টে ঢুকলেন সুধীন চ্যাটার্জি। মনে হল সুধীনবাবু বেশ উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। সাজঘরে ঢুকে জামা খুলে একটু বসে এক গ্লাস জল চাইলেন মালি 'নাট্টার' কাছে। ফ্যানের রেগুলেরটা একটু জোর করে দিয়ে শুয়ে পড়লেন বেঞ্চের উপর পা উঁচু করে। একবার এধার একবার ওধার করতেই থাকলেন। সময় আর কাটে না। ইতিমধ্যেই বেশকিছু দর্শক হাজির হয়ে গিয়েছে টেন্টের চতুর্দিকে পুলিশ পোস্টিংও সকাল থেকে। যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় ওখানে। পুলিস সরিয়ে দিচ্ছে লোকজন। সময় গড়িয়ে চলেছে একটা দেড়টা দুটো। এই ভাবে সময় যত এগোচ্ছে সুধীন চ্যাটার্জির চোখে মুখে ততই যেন একটু চঞ্চলতার ভাব দেখতে পাচ্ছি। ইতি মধ্যেই একে একে ছয়জনের তালিকা অনুযায়ী সবাই হাজির। বিশ্রাম নিচ্ছেন প্রত্যেকেই। এখন আড়াইটা সুধীনবাবু বাথরুমে ঢুকলেন। ফিরে এলেন দুটো পঞ্চাশ মিনিটে। মুখে ঘাড়ে হাতে জল দিয়ে। কেন জানিনা মুছলেন না টাওয়েলে। পাখার তলায় দাঁড়িয়ে শুকিয়ে নিলেন। বসেই একটা সিগারেট ধরালেন, নিমেষের মধ্যেই



রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি মাঠে নামবার আগে ওয়ার্ম-আপ /শংকর ৭

শেষ হয়ে গেল। তিনটের সময় নিজের নির্ধারিত এক নম্বর লকার থেকে প্রয়োজনীয় কিডস গুছিয়ে নিলেন। বাড়ির থেকে নিয়ে এসেছেন বাঁশী এবং একটা বিদেশী মুদ্রা। তিনটে দশ মিনিটের সময় আবার একটা সিগারেট ধরালেন। সুধীনবাবুও টেনসনে ভুগছেন?

এরই ভেতর মোহনবাগান মাঠ থেকে খবর এল রেফারিদের কমপ্লিমেন্টারী কার্ড সিজ হচ্ছে। একটা প্রতিবাদের ঝড় উঠল। রেফারিদের ভেতর থেকে আজকের মাঠে এই ধরনের (কার্ড সিজ) ঘটনা ঘটতে থাকলে মাঠে রেফারি যাবে না। ছুটলেন সি আর এর সেক্রেটারি।

তিনি শান্ত করলেন সতীর্থদের। তিনটে পনের মিনিটের সময় রমাকান্ত গাঙ্গুলি সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেলেন ঘরে ঢুকে সুধীন চ্যাটার্জি এবং লাইন্সম্যানদ্বয় যথাক্রমে সুনীল অধিকারী এবং জগদীশ পালকে। মরশুমে প্রথম দেখলাম ফোর্থ অফিসিয়াল সুখেন্দু শেখর গুপ্তকে।

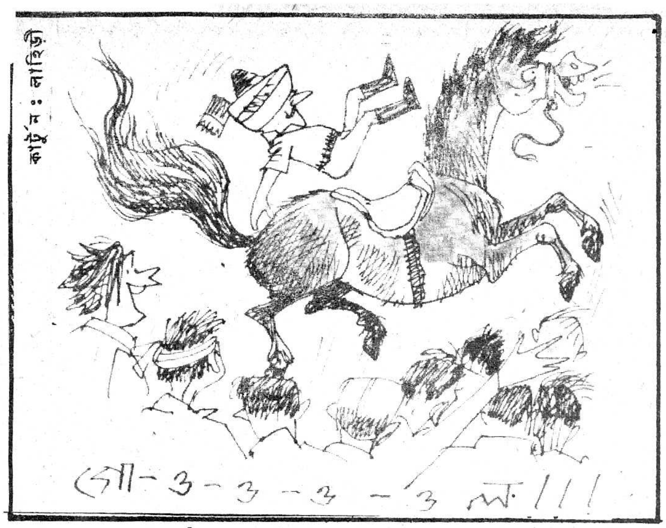
তিনটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় সহকর্মী এবং প্রাক্তণ খেলোয়াড় অজয় লাহিড়ি দেহ ম্যাসেজ করে দিচ্ছেন মেডিক্রিম দিয়ে। তিনটে পঁয়তাল্লিশে লনে ওয়ার্ম আপ করে নিলেন চড়া রোদ্দুরের মাঝে। তিনটে পঞ্চাশ নাগাদ টেন্ট থেকে বেরোতে বেরোতেই নিজেদের ভেতর আলোচনা সেরে নিতে লাগলেন—কিভাবে আজকের খেলা পরিচালনা করবেন। ইতিমধ্যে পুলিশের ওয়ারলেশ ভ্যান (ডব্লু-এম-ডি ৯৮১) হাজির মাঠে নিয়ে যাবার জন্য। গাড়ি যখন স্টার্ট দিল তখন তিনটে বেজে পঞ্চান্ন মিনিট। গাড়ি এগিয়ে চলল মেয়ো রোড ধরে গুরু নানক সরণি দিয়ে। মাঠে পৌছতে সময় লেগেছে সাত মিনিট। তখন চারটে বেজে দুই। মাঠের ভেতর সুধীনবাবুর সাথে আই এফ এর সেক্রেটারি অশোক ঘোষের কিছু আলোচনা হল। বিষয় মনে হয় নিরাপত্তা। আবার ওয়ার্ম আপ করলেন। চারটে বেজে সাত মিনিটে প্রথম মাঠে নেমে গেলেন দলবল নিয়ে। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর টস্ হল চারটে তের মিনিটে। চারটে পনের মিনিটে খেলা শুরু। খেলার মেজাজকে শক্ত হাতে ধরে রইলেন। এরপর শেষ বাঁশি বাজিয়ে দিলেন সুধীনবাবু। কিছু অপেক্ষার পর মাঠে আবার একই গাড়িতে করে ফিরে এলেন টেন্টে। তখন ছয়টা বেজে তিন মিনিট। ভাল খেললে যেমন খেলোয়াড়দের ভেতর একটা স্বস্তির বা আনন্দ উচ্ছ্বাসের ভাব দেখি এই ড্র ম্যাচে আমি বিজয়ী (রেফারি) সুধীনবাবুর ভেতর তেমন দেখলাম উচ্ছ্বাসের ভাব। এরপরই ড্রেসিংরুমে এসে ভাল খেলানোর জন্য অভিনন্দন এল সহকর্মীদের কাছ থেকে। সুধীন চ্যাটার্জি রেফারিদের মান রেখেছেন। চারদিকে স্বস্তির হাওয়া।

মাঠে যখন খেলা, তখন বাইরে

বিশ্বজিত সিংহ : একস্ট্রা হবে নাকি দাদা?

রাজভবনের দক্ষিণ গেটের বিপরীত দিকে খোলা মাঠের ধারে জনে জনে ধরে টিকিট চাইছিলেন সন্তোষ। বেলঘরিয়া থেকে এসেছেন। একা। বেলা দেড়টায়। সওয়া দু' ঘণ্টা কাবার। ব্ল্যাকে মিলছে বটে। ষাট পয়সার টিকিট ষাট টাকা। কোথাও পঁচাত্তর। এই দর।

'ডি' গেটের মাথায় পতপত করে উড়ছে ➜



সবুজ-মেরুণ পতাকা। নীচে রাস্তার ধারে মধ্য কলকাতার স্বাধীন। কাছেই গ্যালারির উঁচু ধাপে চড়ে পাড়ার সখা। স্বাধীন এদিক ওদিক দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এই বিটু, তোরটাই দেনা। ঢুকি।

চারটে বাজে বাজে। 'ই' গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন চার কালো জামা। রেফারি, লাইন্সম্যান, রিজার্ভ।

এ সময়ই চারদিকে গগনভেদী নিনাদ। ইডেনের দিকের সব গ্যালারি থেকেই। গেটের মুখে উৎসাহীদের উপচে পড়া ভীড়। ঘোড়সওয়ার পুলিশ, লাঠি হাতে পুলিশ ঘিরে দিলেন। সামনে পিছনে পুলিশ রেখে সাতটা এ্যামবাসাডার, ফিয়াট। সূর্যের ছটায় লাল-হলুদ আরো উজ্জ্বল। প্রথমেই গুরদেব সিং। শেষদিকে নীলাভ গেঞ্জি শার্ট গায়ে অরুণ ঘোষ। কোচ। কপালে আঙুল ঠেকিয়ে দুবার সূর্যদেবকে প্রণাম করলেন। মোহনবাগান গ্যালারিতে তখন শিস। রাস্তার ধার থেকে এক সমর্থক চিৎকার করে উঠলেন, গুরু, কিন্তু চাই।

ঘড়িতে চারটে পাঁচ। ভি আই পি গেটের মুখেও অত্যুৎসাহীদের জটলা। যদি মওকা পেলে সুরুৎ করে ঢোকা যায়। মাঝে মাঝে পুলিশ ঢাল উঁচিয়ে তেড়ে এসে পার করে দিচ্ছে ওপারে।

নৈহাটি থেকে এসেছেন কুমুদ চ্যাটার্জি। ফেরীঘাটের কাছে বাড়ি। বেলা দু'টোয়। কয়েকবার ঢোকার চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হয়ে যেন নিজেকেই ধমক দিলেন ঃ ধুত্তোর, এসে ভুল করেছি। কারো বাড়িতে বসে টিভি দেখলে ভালো হতো।

দূরে গেটের মুখে পুলিশ আটকাচ্ছে কৃষিমন্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভারকে। তিনি ভেতরে মন্ত্রীকে খবর দিতে যাবেন। পুলিশ বলছে ঃ নেহি নেহি, তুম ঝুটা আদমী। টানতে টানতে তাকে হাজির করা হল এক এ সি-র কাছে।

ইডেনের দিকে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কিছু তরুণ। হতাশ মুখ। ক্যালকাটা আর্মড পুলিশের তিন সেপাই তখন এক ধারে মতলব করছেন নিজেদের মধ্যে। বাইরে ডিউটি, ভেতরে ঢুকি কি করে?

মাঠের মধ্য থেকে পটকার শব্দ, হুল্লোড়, তীক্ষ্ণ শিস। চার নং গেটের কিছু দূরে দাঁড়ানো এক তরুণ তার সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিলেন ঃ স্টেডিয়াম হলে এ ঝক্কি আর হবে না।

সওয়া চার। মোহনবাগান গ্যালারি থেকে চিৎকার। বাইরে বিরস বদনে সন্তোষপুরের সুজিত দাস বললেন, নির্ঘাৎ মোহনবাগান মুভ করছে।

মিনিট সতেরো পরে আরো জোরে চিৎকার গোওল……গোওল……গো……একটানা। কাঠের বেড়ায় হেলান দিয়ে এক সাব ইন্সপেক্টার মন্তব্য ছুঁড়লেন ঃ রহিম, তোমার ফেবারিট গোল করেছে।

ভারতশ্রী কমল ভাণ্ডারী ট্রাফিক পুলিসে আছেন। তিনি এ মহারণে কোনো দলেরই সাপোর্টার নন। এদিন তাঁর একমাত্র ইন্টারেস্ট মাঠে যেন গণ্ডগোল না হয়।

বাবুঘাটের দিকে পথের ধারে পুলিশের জীপ। অফিসারের হাতে ট্রানজিস্টার। তাকে ঘিরে মাঠে ঢুকতে না পারা জনা কুড়ি রিলে শুনছেন। ভাষ্যকার তখন বলে চলেছেন ঃ মোহনবাগানের প্রথম কর্নার। চলেছেন গৌতম……।

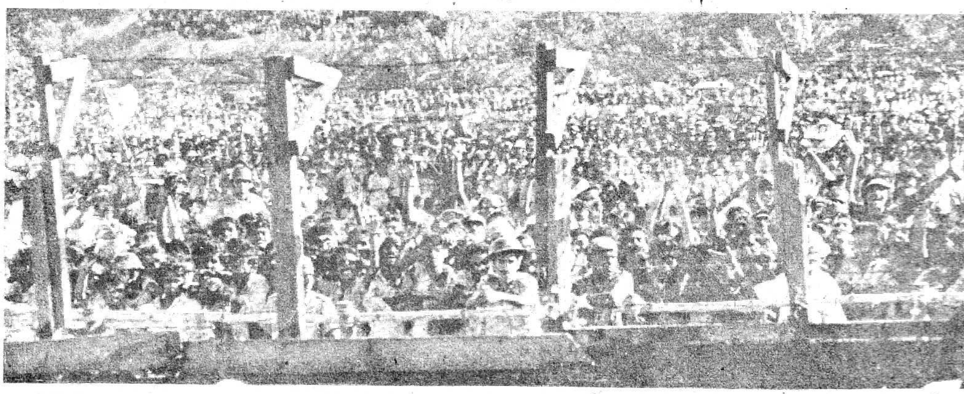
ওদিকে গাঢ় নীল গেঞ্জি গায়ে আই এফ এ সেক্রেটারি অশোক ঘোষ মাঠ থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এক অফিসার কৌতুহলী। উনি, হঠাৎ?

সুদর্শন পুলিস অফিসার গুরুপ্রসাদ ব্যানার্জি মনের দিক থেকে মোহনবাগান। তবে মাঠের বাইরে বলে দুঃখ নেই। ডিউটি ইজ ডিউটি।

ইতিমধ্যে সাবিরের গোল শোধ করে দিয়েছে মোহনবাগান। ইডেনের মধ্যে এক বাদামওয়ালার কাছে 'রেডিও'। দুই উচ্ছল তরুণীর একজন ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে দিল? মানস। প্রশ্নকর্ত্রী মোহনবাগান। দূরে দাঁড়ানো সাথী ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের মেয়ে আবার বললেন, মানস প্রেসটিজ রেখেছে। পাড়ায় সাপোর্টার বলে টিটকারি দিত। সঙ্গিনী ফোঁস করে উঠলেন ঃ দেখ না, পাঁচ মিনিট পরে সাবির আর একটা দিয়ে দেবে। দুই কিশোরীই নাম বলতে নাচার। ইস্, লুকিয়ে ইডেনে এসেছি না।

গোল শোধের খবর শুনেই মানিকতলার পীতাম্বর ভট্টাচার্য লেনের লজেন্স, চানাচুর বিক্রেতা কেদার গুপ্ত আনন্দে মাল বিক্রি বন্ধ করে দিলেন। খুশীতে কিছু মাল বিলিয়েও দিলেন। ওর কাছে শুনলাম, মাঠে ঢুকতে পারলে বিক্রী, খেলা দেখা দুই হতো। হয়নি। বড় দুঃখ।

মাঠের পশ্চিম দিকে ছোট্ট সেতুর উপর জনা পঞ্চাশ। নানাবয়সীর জটলা। তিনটে রেডিও। তারা আলোচনা করছিলেন ঃ ওই দূরে মোহনবাগানের গ্যালারি থেকে পাঁচজন উত্তেজনায় নীচে পড়েছে, রক্তারক্তি কাণ্ড। একজন বেশ শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য করলেন ঃ আমরা বাইরে বেশ আছি বাবা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে কী লাভ?



বড় খেলায় ময়দানের জনারণ্য/অরুণ মুখার্জি

দক্ষিণ দিকে খোলা অংশ নিয়ে খেলা দেখার জন্য জড়ো হয়েছেন অন্তত হাজার দশ মানুষ। এখানেও যেন গ্যালারি। নীচু ডাঙায় ইঁট, টব, বেঞ্চি পেতে দাঁড়িয়ে। অনেকে দূরে উঁচু জমিতে, গাছের ডালেও।

বছর চল্লিশের এক বিহারী ভদ্রলোক এসেছিলেন ইডেনে, আউট্রামে বেড়াতে। সঙ্গে বউ আর ছোটো বেটা। এত হৈ চৈ আর লোকজনের ভিড় দেখে বাচ্চা অবাক। দূরে মাঠের দিকে চোখ রেখে তার জিজ্ঞাসা ঃ খেলা? বাবার জবাব ঃ 'খেলা নেহি বেটা, কোই বড়া কুস্তি হোগা।'

সবার কান যখন রেডিও আর চোখ মাঠের দিকে তখন বৌবাজারের কিশোর হকার সুনীল দাস খেলার কাগজগুলি সাজিয়ে চুপ করে বসে। ঝোলা ভর্তি। একশো কপি এনেছিলেন। তিরিশটির বেশি কাটেনি। হকার কার্ড নেই বলে ভিতরে ঢুকতে পারেন নি। অবশ্য খেলা দেখায় কোন আগ্রহ নেই।

খেলা তখন শেষ পর্বে। পূবদিকে মাঠে গাছের ছায়ায় কম করেও কুড়িজন। পুলিশও ভীড়ের মধ্যে। ট্রানজিস্টার একটিই। মোহনবাগান আক্রমণ শানাতেই একদল হৈ হৈ করে উঠলেন। অন্যরা বাধা দিলেন। বললেন, চুপ করুন। আমাদের আরো জোরে হৈ চৈ করার পালা আসছে।

আকাশবাণীর কাছে এক মধ্য বয়স্ক মাঠের দিকে চাইলেন। কি ব্যাপার, ফ্ল্যাগ নামলো না কেন? আর কত বাকী? তার আগ্রহ খেলায় নয়। খেলা ভাঙলে তিনি বাসে উঠতে পারবেন না। সেজন্যই উৎকণ্ঠা, তাড়াহুড়ো।

ওদিকে এক স্মার্ট কিশোর পুলিশের ওয়ারলেস ভ্যানের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রেজাল্ট? ড্র চলছে শুনে বলে উঠলেন ঃ সব গট আপ গেম। হেসে অফিসারটি জবাব দিলেন ঃ তবে আজ আর গণ্ডগোল হবে না ভাই।

দীর্ঘক্ষণ ঘেরা মাঠের বাইরে চারধারে গাছের ছায়ায় ঘোড়া, ফুটপাতে জীপ, রাস্তায় ওয়ারলেস ভ্যান রেখে সব ধরনের পুলিশই বসে কিংবা দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পসল্প করছিলেন।

তারা গা ঝেড়ে রেডি হলেন। কয়েকজন ছেলে ছোকরাকে মাঠের দিকে আসতে দেখে এক গোঁফওয়ালা মোটাসোটা সেপাই হাঁক দিলেন ঃ খেলা খতম। এক এক গোল হো গিয়া। অভি ঘর যাও। ●





সালে পরলোকে ঃ ভারতীয় ফুটবলের আর একটি ইন্দ্রপতন

বিনু চ্যাটার্জি ঃ কোট্টায়ামে থিরনা কারায়-এর পুতান পরমভিল বাবাকান্নু রফতার আবদুর সালে চিরকালের জন্য চলে গেলেন ১৯৭৮ সালের ১ জুন ভেঙ্কটেশের মৃত্যুতে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তার তিনমাস যেতে না যেতেই আর একটি শোকবার্তা আছড়ে পড়ল কলকাতার বুকে। মহৎ খেলোয়াড় আপ্পারাও চলে গেলেন। ভেঙ্কটেশের মৃত্যুর একমাস আগে সালের প্রথম স্ট্রোক হয়। ডাক্তারদের নির্দেশ অমান্য করে সালে এসেছিলেন সেদিন ভেঙ্কটেশের শবদেহের কাছে শ্রদ্ধা জানাতে। তার একটি বছর পর তিনিও চলে গেলেন।

সোমবার ২৫ জুন হঠাৎ চোখে পড়ল ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব পতাকা অর্ধনমিত। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি কাস্টমস টেন্টের পতাকাও অর্ধনমিত হয়ে রয়েছে। বৈদ্যুতিক শকের মতো সালের মৃত্যু সংবাদের খবরটা এসে পৌঁছল। রবিবার ২৪ জুন বেলা তিনটায় সালে মাদ্রাজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মাদ্রাজ মেরিন হাউস থেকে কলকাতা কাস্টমসে এই দুঃসংবাদটি জানানো হল। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল করে বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এবং তার মরদেহ কোয়েম্বাটুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেশে ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফেরার পথে মাদ্রাজের কাছে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সালে। তারপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। আমরা বঞ্চিত হলাম। মৃত্যুর সময় আপ্পারাও-এর মতন সালেকেও আমরা এই কলকাতায় শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। তবে খবরটা যার কাছে যেমন ভাবেই পৌঁছেছে সঙ্গে সঙ্গে নতমস্তকে সকলেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই স্বল্পভাষী, নিরঅহংকারী শান্ত, বিনয়ী খেলোয়াড়টির প্রতি। সালে কোন নির্দিষ্ট ক্লাবের নয়, সালে সকল মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তার চটকদারী খেলা দেখিয়ে মানুষের মনকে, তিনি জয় করেছেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। তাই প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন ভালবাসা। দেখা হল সুনীল ঘোষের সঙ্গে। সুনীল ঘোষ পকেট থেকে একটি রুমাল বার করে চোখ মুছতে মুছতে বললেন—১৯৪৫ সালের কথা। ত্রিবান্দ্রম গোল্ডকাপে তখন ইস্টবেঙ্গল খেলতে গেছে। কোয়েম্বাটুর থেকে আসা একটি দল এইচ এম সির সঙ্গে খেলা, সে খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতল। আমি তখন অধিনায়ক। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম বিপক্ষ দলের একটি ছোট ছেলের খেলা দেখে। সেদিন মাঠের সর্বত্র ওকে দেখা গেছে। কি তার লড়িয়ে মেজাজ। আমায় চঞ্চল করে তুলেছিল। মিরান সাহেবের কাছে সালে তখন খেলা শিখছেন। দাদা সুশীল ঘোষ ম্যানেজার হিসেবেই এসেছিলেন। দাদার সঙ্গে যুক্তি করে গোদ ভর্মা রাজার সহযোগিতায় সালেকে কলকাতায় নিয়ে এলাম। ও তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। ওকে আমাদের বাড়িতেই তুললাম ১৮৩।১বি পার্ক স্ট্রিটে। সালের পরীক্ষার পাশের খবর এল। ভর্তি হল সি টি কলেজে। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে চলল নিয়মিত অনুশীলন। ইস্টবেঙ্গলে তখন এক পাণ্ডবই মাত করে দিচ্ছেন। তিনি আপ্পারাও। এসেছেন ১৯৪১ সালে। দ্বিতীয় পাণ্ডব অর্থাৎ সালে এসে যোগ দিলেন ১৯৪৫ সালে। ওই বছর তিনি নিয়মিত খেলতে পারেননি। কারণ গোলের রেকর্ড সৃষ্টিকারী সেই নায়ার তখন ইস্টবেঙ্গলের লেফট-আউট। ভিজে মাঠ থাকলে নায়ারকেই খেলতে হত। আর মাঠ শুকনো হলে সালে চান্স পেতেন। এইভাবে ১৯৪৫ সাল কাটলো। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত একটু একটু করে সাফল্য সঞ্চয় করে সালে সাফল্যের পাহাড় সৃষ্টি করেন।

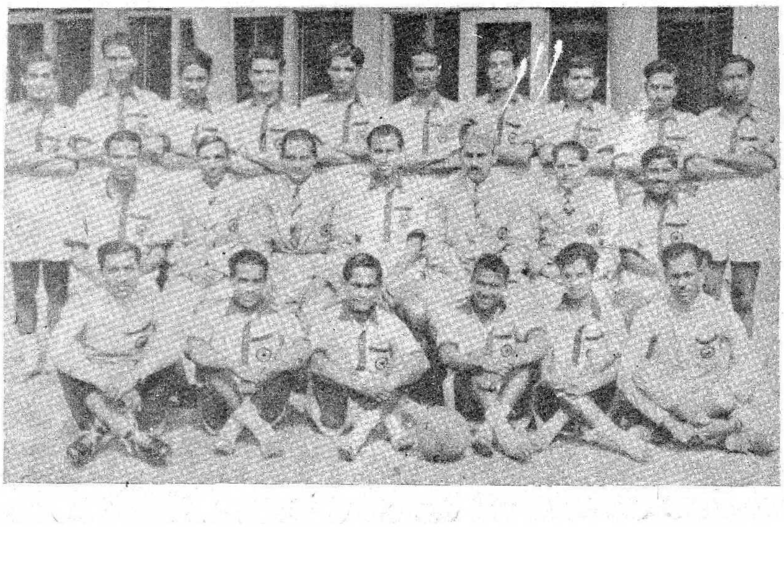
১৯৪৮ সালে আর এক পাণ্ডব যোগ দিলেন। তিনি ভেঙ্কটেশ। আর দুই পাণ্ডব অর্থাৎ ধনরাজ ও আমেদ যোগ দেন ১৯৪৯ সালে। ফুটবলের ইতিহাস রচনা করেছেন এই পঞ্চপাণ্ডব। পঞ্চপাণ্ডবের তিন পাণ্ডবকে হারাবার পর ধনরাজ বললেন—ঈশ্বরই জানেন এবার কে? ধনরাজ, না আমেদ? মঙ্গলবার ধনরাজদা অফিসে আসেননি। বুধবার সকালের দিকে ধনরাজদাকে দেখলাম সাত্তারদার সামনে বসে আছেন। ধনরাজদাকে তার ওই উক্তিটা মনে করিয়ে দিতেই উনি বললেন, ভগবানের দিব্যি করে বলছি আমি গেলে ক্ষতি নেই তবে, আমেদ যেন ১০০ বছর বেঁচে থাকে। ও চলে গেলে ভারতীয় ফুটবলের একটি অধ্যায় চলে যাবে।'

১৯৪৫ সালের কথা। আই এফ এ শিল্ড কোয়ার্টার ফাইনাল হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে। ধনরাজ খেলছেন হায়দ্রাবাদ দলে। ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়াডে খেলছেন তখন টিটু কর, আপ্পারাও, সোমানা, সুনীল ঘোষ, নায়ার। খেলার প্রথম দিন ড্র হল দ্বিতীয় দিনও ড্র হল গোলশূন্যভাবে। এই দু'দিনই মাঠ ভিজে থাকার জন্য সালে খেলতে নামেননি। নায়ারই খেলেছেন লেফট আউটে। তৃতীয় দিনে খেললেন টিটু কর, আপ্পারাও, পাগসলে, সুনীল ঘোষ ও নায়ারের জায়গায় সালে। সালের সে খেলা আজও ধনরাজ ভুলতে পারছেন না। সর্পিল গতি ধনরাজকে সেদিন তাক লাগিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল জিতল ২—০ গোলে। ১৯৫০ সালে তারই অধিনায়কত্বে ইস্টবেঙ্গল পেল লিগ, আই এফ এ শিল্ড এবং ডি সি এম ট্রফি। ১৯৫১ সালে ভারত প্রথম এশিয়ান ফুটবলে সোনা পায়। সালে ছিলেন সে দলের সদস্য। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিক্স। ইস্টবেঙ্গলের ১৯৫৩ সালে রাশিয়া, বুখারেস্ট সফরে সালে গিয়েছেন। ১৯৫১ সালে শিল্ড ফাইনাল হচ্ছে সেই চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে। প্রথম দিন ০—০ গোল। সালে কাঁদতে কাঁদতে টেন্টে ফিরে এলেন। জ্যোতিষ গুহ সালেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাঁদছো কেন? শিশু স্বভাবের সালে বললেন আমার কানে এলো—কে যেন বলল পরের দিন ইস্টবেঙ্গল হেরে যাবে। জ্যোতিষ গুহ সালেকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, দেখবে পরের দিন তুমিই গোল করবে। হয়েছিলও তাই। প্রথমার্ধেই দুটি গোল। এবং চোখ ধাঁধানো গোল দুটো করলেন সালে। প্রথম গোলটা—ভেঙ্কটেশের সেন্টার গিয়ে পড়ল ধনরাজের কাছে, ধনরাজ দিলেন সালেকে। মোহনবাগানের রাইট হাফ রতন সেন বাধা দিতে এলেন, সালে আউট সাইড ডজ করে তাকে কাটিয়ে নিলেন। বড়ুয়া ছুটে এলেন। বড়ুয়াকে ঘায়েল করলেন ইন সাইড ডজ দিয়ে। অবশেষে বিপদ বুঝে শৈলেন মান্না ঝাঁপিয়ে পড়লেন সালের কাছে। সালে তাকে আউট সাইড ডজ দিয়েই গোলে শট। কামানের গোলার মতো বলটা ছিটকে জালে জড়িয়ে গেল। আর দ্বিতীয় গোলটাও ওই ভেঙ্কটেশের সেন্টার বড়ুয়া ও ধনরাজের মাথার উপর দিয়ে যায় সালের কাছে। বলটা মাটিতে একটা ধাপ দিল। দ্বিতীয় ধাপটি পড়ে মাটি থেকে একটু উপরে উঠতেই ঝাঁপিয়ে তীব্র সট। 'গোল' শব্দটি আকাশে বাতাসে অনুরণিত ছিল অন্তত পাঁচ মিনিট। যা আজও অনেকেরই মনে আছে।

বিপক্ষ শিবিরের খেলোয়াড় হলেও সাত্তার বললেন: সালের মতন খেলোয়াড় খুব কম দেখেছি। ওর গতি ছিল প্রচণ্ড। ও যখন ইনসাইড আউট সাইড ডজ করে ছুটতো তখন ওকে রোখাই মুস্কিল ছিল। রিসিভিং-এর তুলনা ছিল না। সালে উপরের বল এত সুন্দর রিসিভ করতো যাতে একটা দুটো খেলোয়াড় হামেশাই কেটে যেত। আর টাচ লাইন থেকে ব্যাকপাশ ছিল খুব বিপজ্জনক। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে সালে ছিল আমার পরম বন্ধু। ১৯৫২ সালের কথা। ডি সি এম-এর সেমিফাইনালে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল আর হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফটের মধ্যে। প্রথম দিন ০-০। দ্বিতীয় দিনের খেলা এয়ার ক্র্যাফটের যেশুদাস সালেকে আহত করলো। এ্যাঙ্কেল ফ্র্যাকচার, সালে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। অবশ্য পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আপ্পারাও, আমেদ ও ধনরাজ সালেকে বললেন: তুমি বসে যাও। তুমি ওই অবস্থায় খেলো না। কিন্তু কি অসম্ভব মনের জোর সালের। সে বললো দশজনে না খেলে আমি মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো কাজ হবে। গ্যালারির সমস্ত দর্শককে হতবাক করে সালে ওই অবস্থায় দুটো গোল করে টিমকে জেতায়।

সালেও আপ্পারাও-এর মতো আমুদে ছিলেন। ১৯৫২-র ওলিম্পিক থেকে ঘুরে আসার পর একদিন সালে আপ্পারাওকে বলেছিলেন আপনি এতবড় খেলোয়াড় তবু বিদেশে যাননি কেন? আপ্পারাও সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, কে বললো আমি বিদেশে যাইনি। সালে, ধনরাজ, আমেদ, ভেঙ্কটেশ সকলেই অবাক হয়ে গেলেন কবে আপ্পারাও বাইরে গিয়েছিলেন। তারা বিস্ময় প্রকাশ করলেন। আপ্পারাও সালের দিকে চেয়ে জবাব দিয়েছিলেন, কেন ফ্রেঞ্চ টেরিটোরী চন্দননগরে তো আমি গিয়েছি। হাসির ধুম পড়ে গেল।

সালে হাসতে হাসতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কিনা জানি না। তবে তিনি হাজার হাজার ক্রীড়ানুরাগীদের চোখের জলে ভাসিয়ে গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকল খেলোয়াড়কে আবার একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন: তোমরা নিরহঙ্কার হও, আদর্শ খেলোয়াড় হও, খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে খেললে তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।



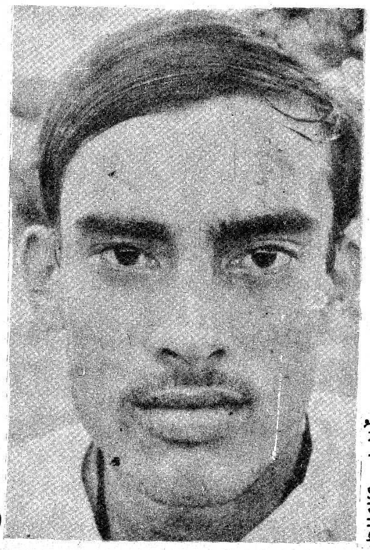
হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ভারতীয় দল: পিছনের সারি—বাঁদিক থেকে রুনু গুহঠাকুরতা, মহঃ নূর, পি বি এ সালে, চন্দন সিং, ব্যোমকেশ বসু, সম্মুখম, এস সর্বাধিকারী, আজিজ, সাত্তার ও মইনুদ্দীন। মাঝের সারি—আমেদ, কোচ রহিম, এস দত্ত রায়, ক্যাপ্টেন শৈলেন মান্না, মেজর লক্ষ্মণ সিং, বি আর কে টাণ্ডন ও দেওয়ালাল। বসে—ধনরাজ, ও লতিফ, ভেঙ্কটেশ, জে অ্যান্টনি, এস রায় ও পি অ্যান্টনি (ছবি: সাত্তারের সৌজন্যে)

এবার জুনিয়র ফুটবলারদের কে কে নজর কেড়েছে

(২)

রক্ষণের নৈপুণ্য দেখিয়ে বি এন আরের লেফট স্টপার সুদীপ চ্যাটার্জি বর্তমানে ময়দানের উদীয়মান স্টপারদের পাশে নিজের নাম লিখিয়েছে। বিশ্বস্ত ডিফেণ্ডারের সমস্ত গুণই সুদীপের করায়ত্ত। দলের দরকারে রক্ষণের পাশে আক্রমণের রসদ জোগান দেয় প্রায়ই। তবে অনভিজ্ঞতার জন্য মাঝে মধ্যে কিছু কিছু ভুল হয়ে যায়। তাছাড়া ট্যাকলিংয়ের দিকে আরও একটু নজর দিলে আরও ভাল ফুটবল পাওয়া যাবে ওর কাছে।

হাওড়া জেলার শিবপুরের ছেলে সুদীপ ১৯৬৭ সাল থেকে টেনিস বলে আণ্ডার হাইট খেলে বেড়াত। প্রাইজও জুটে যায় বেশ কিছু। ওই রকম একটা টুর্নামেন্টে ওর খেলা দেখে হাওড়া সহযাত্রী ক্লাবের সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী ওকে টেনে নিয়ে যান এবং আধুনিক ফুটবলের এ বি সি ডি শেখান। '৭৬ সালে একই সঙ্গে হাওড়া জেলার হয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র দলে রাইট হাফ খেলেছে যথাক্রমে বালুরঘাট ও শ্রীরামপুরে। পরে বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অরুণ ঘোষ ওকে বি এন আরের কোচ আলিফ খানের কাছে অনুশীলন করতে পাঠান। সে বছর মন দিয়ে নিজেকে তৈরি করার ফাঁকে কুমারটুলির বিপক্ষে একটি ম্যাচও খেলেছিল। গতবছর দলের সিনিয়র প্লেয়ার অনিল দে'র কথায় স্টপার হিসেবে অতীতের দিকপাল বলরামের কাছে নিজেকে ঝালিয়ে নেয়। লিগে নিয়মিত না খেললেও



সুদীপ চ্যাটার্জি

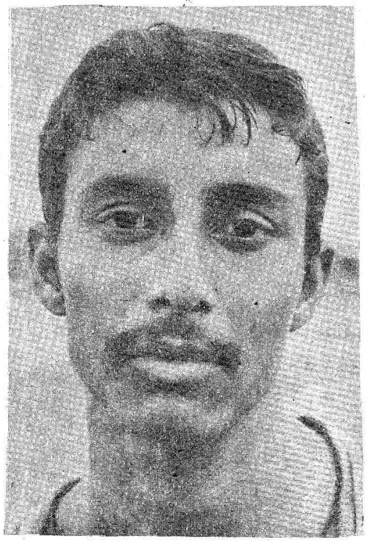
আই এফ এ শিল্ড থেকে সুদীপ বি এন আর রক্ষণভাগের লড়াকু যোদ্ধা হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। গতবছর খেলার জন্য চাকরিও পেয়েছে বি এন আরে। এছাড়া আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে সুদীপ ছিল বাংলা রক্ষণের প্রধান খুঁটি।

২০ বছর বয়সী লম্বা ও ফরসা চেহারার সুদীপ ৭৫ সালে শিবপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে স্থানীয় দীনবন্ধু কলেজে ভর্তি হয়। বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বছরে পড়ার সময় খেলার টানে পড়াশোনা শিকেয় তুলে দেওয়ায় বাড়ির সবাই অখুশী। শক্ত সমর্থ চেহারার সুদীপের ইচ্ছে অশোকলাল ব্যানার্জির মত খেলার।

★

সম্ভাবনাপূর্ণ স্ট্রাইকার হিসেবে খিদিরপুরের রাইট স্ট্রাইকার রথীন দাসের নামটাও ময়দানে বেশ নাড়াচাড়া হচ্ছে। অন্যান্য সব বিভাগে রথীনের ভাল দখল থাকলেও স্যুটিংটা আরও চোস্ত করা দরকার। এছাড়া বিপক্ষ গোলমুখে পৌঁছে মাথা ঠিক রাখতে পারলে আরও গোল পাবে সন্দেহ নেই।

শিবপুরের ছেলে রথীন ছোটবেলায় আশে পাশে টেনিস বলে আণ্ডার হাইটের খেলায় বেশ নামডাক ছিল। ৭৪ সালে চামড়ার বলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন পাড়ার শ্রীমান চক্রবর্তী (রোসাদা)। হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তনের হয়ে চুটিয়ে খেলেছে জেলার বিভিন্ন স্কুল টুর্নামেন্টে। '৭৭ সালে রথীন অধিনায়কত্ব করেছে হাওড়া জেলা স্কুল দলের। একই বছরে অমৃতসরে অল ইণ্ডিয়া স্কুল ফুটবলের আসরে বাংলার এই দুরন্ত স্ট্রাইকারটি নির্বাচকদের খেলা দেখিয়ে ভারতীয় স্কুল দলের হয়ে আগ্রায় এশিয়ান স্কুল ফুটবলে খেলার সুযোগ আদায় করে নেয়। অবশ্য ভারত দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেমিফাইনালে তাইল্যাণ্ডের কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায় ৪-৩ গোলে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার আগে তৎকালীন বাটার কোচ অচ্যুত ব্যানার্জির কাছে নিজেকে মেজে ঘষে নিয়েছিল। এক ফাঁকে মালদায় আন্তঃজেলা জুনিয়র ফুটবলে হাওড়ার প্রতিনিধিত্বও করেছে। অবশ্য সুযোগটা এসেছিল শ্রীমানদার মাধ্যমে। গতবছর স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে খেলেছে। এছাড়া আগরতলায় জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে জয়ী বাংলার অন্যতম সদস্য



রথীন দাস

ছিল। এবছর খিদিরপুরে এসেছে ভূতোদার ডাকে।

ছিপছিপে শ্যামবর্ণের রথীন এখন হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তনের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। ১৮ বছর বয়সী রথীনের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। বাবার পেনসন ও এক দাদার চাকরির টাকায় সংসার চলে। তবে খেলাধূলার ব্যাপারে সকলেই দারুণ উৎসাহ দেয় রথীনকে। প্রিয় খেলোয়াড় হাবিব। অবসর সময় গান শুনতেই পছন্দ করে।

★

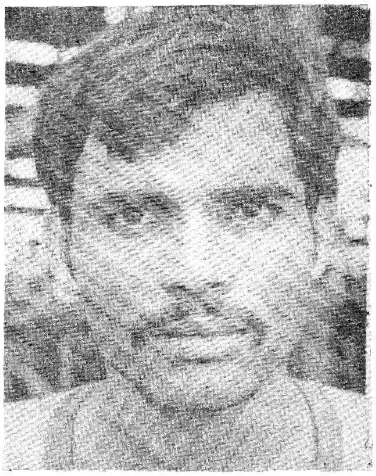
এবছর কলকাতার ভিন্ রাজ্যের যে সমস্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা কলকাতার দর্শকদের মনে সাড়া জাগিয়েছে তাদের মধ্যে এরিয়ানের ফায়ারিং স্কোয়াডের নিয়মিত খেলোয়াড় দেবাশিস রায় অন্যতম। আসামের ছেলে দেবাশিস স্ট্রাইকার পজিশনে বেশী পারদর্শী হলেও স্কিমার হিসেবেই ওকে বেশী চোখে পড়েছে। অল্প কদিনেই দলের অন্যান্যদের সঙ্গে সুন্দর বোঝাপড়া তৈরি করে নিয়েছে। এছাড়া হেডিং, দরকার মত তাড়াতাড়ি জায়গা বদল করে দ্রুত গতিতে বিপক্ষ ডিফেন্স ভেঙে ফেলতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা দারুণ পরিশ্রমী।

আজ থেকে ২৪ বছর আগে আসামের করিমগঞ্জ শহরে দেবাশিসের জন্ম। পাড়ার পঞ্চপ্রদীপ ক্লাবেই প্রথম বলে লাথি মারা শেখে। স্থানীয় নীলমণি হাইস্কুলের হয়েই প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের স্বাদ পায় ইণ্টার স্কুল ডিস্ট্রিক্ট খেলার সময়। ৭৩ সালে স্কুল ফাইনাল পাস করে করিমগঞ্জ কলেজের হয়ে গৌহাটি ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত আন্তঃকলেজ ফুটবলে একটি হ্যাটট্রিক সহ মোট সাতটি গোল করে গৌহাটির প্রথম সারির দল টাউন ক্লাবে ডাক পায়। ৭৪-এ টাউন ক্লাবে

যোগ দিয়ে কোয়েম্বাটুরে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে আসাম দলে নিজের জায়গা করে নেয়। পরের বছর মণিপুর,দেবাশিসের অধিনায়কত্বে আসাম কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল।'৭৫-'৭৬ও'৭৭ এই তিন বছর রাজ্য দলে এর্নাকুলাম, পাটনা ও কলকাতায় সন্তোষ ট্রফির আসরে দেবাশিসের বাঁধা জায়গা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

এছাড়া দেবাশিস্ ভারতের হয়ে বিদেশে খেলতে গেছে বেশ কয়েকবার। ১৯৭৬ ও ৭৭ পরপর দু'বছর ব্যাংকক ও ইরানে অনুষ্ঠিত এশীয় যুব ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। পরের বছর আমন্ত্রণমূলক ফুটবলে যোগদানকারী ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে কাবুলও ঘুরে এসেছে। এপর্যন্ত কিটু, জার্নেল সিং, অরুণ ঘোষ ও রাশিয়ান কোচ বি কোভিনের কাছে অনেক কিছু শিখেছে।

করিমগঞ্জবাসী এই শক্ত সমর্থ মাঝারি গড়নের দেবাশিসের বহুদিনের ইচ্ছে কলকাতায় খেলার। '৭৫ সালে কলকাতার একটি মাঝারি শক্তির দলের কাছ থেকে ডাক পেলেও আসা হয়নি নানা কারণে। তবে ১৯৭৭ সালে কলকাতায় জাতীয় ফুটবল খেলতে আসার পর পুরোন ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যার ফলে আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করে দ্বিধাহীনভাবে এরিয়ানের ডাকে কলকাতায় চলে এসেছে। বাড়ির এক ছেলে দেবাশিসের পড়াশোনা পি ইউর বেশী এগোয়নি এই ফুটবলের নেশায়। এবার আবার শুরু করার কথা চিন্তা করছে। সুরজিত সেনগুপ্তের ভক্ত এই ছেলেটি খেলার সুবাদেই ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াতে চাকরি পায় ৭৭ সালে। ভাল ফুটবল খেলার চেস্টা ছাড়া আরও একটি বিষয়ের প্রতি দারুণ জোর দিয়েছে দেবাশিস। তা হল ভাষা দুর্বলতা। মাতৃভাষা বাংলা হলেও অসমীয়া ঘরানায় মানুষ। যার ফলে কথা বলার সময় অসমীয়া টান এসে যায়।



দেবাশিস রায়

★

এ বছরই প্রথম ডিভিসন ক্লাবে যোগদান সূত্রে যে ক'টি টগবগে নতুন মুখ ঘেরা মাঠে খেলতে এসেছে, তাদের মধ্যে উয়াড়ির রাইট ব্যাক ১৬ বছরের পংকজ ঘোষের লড়িয়ে মেজাজের খেলা অনেকের প্রসংশা কুড়িয়েছে। ডিফেণ্ডার হিসেবে যা যা গুণ থাকা দরকার তা সবই আছে। তবে অভিজ্ঞতা বা বয়স দুটোই কম। সুতরাং এখনই পংকজের কাছে পরিপূর্ণ রাইট ব্যাকের খেলা আশা করা যায় না। তবে ঠিকমত অনুশীলন করে আধুনিক ফুটবলের কায়দা কানুনগুলো ঠিকমত রপ্ত করে নিতে পারলে আগামীতে ভাল খেলবে এটুকুই বলা যায়।

নাকতলার বাসিন্দা ছিপছিপে মাঝারি গড়নের পংকজের সঙ্গে কেতাবী ফুটবলের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন অ্যাভিনিউ সম্মিলনীর কোচ অশোক গুহ। এর আগে কালিঘাট মর্নিংস্টার ক্লাবের রাইট হাফ হিসেবে এখানে সেখানে আণ্ডার হাইট টুর্নামেন্টে নিয়মিত খেলত। অ্যাভিনিউ সম্মিলনীতে কোচের কথায় ডিফেন্সে নেমে আসে। গত বছর অশোক গুহর সহায়তায় ময়দানে তৃতীয় ডিভিসন লিগে খেলতে আসে হোয়াইট বর্ডার ক্লাবের জার্সি গায়ে। মন্টু চক্রবর্তী ও সুধীর পালচৌধুরী ওকে উয়াড়িতে নিয়ে আসেন। দল গঠনের ট্রায়ালে যোগ্যতা দেখিয়ে প্রথম এগারো জনের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

খেলাধূলার পাশাপাশি লেখাপড়ার দিকেও পংকজের সমান নজর। ১৯৭৭-এ নাকতলা হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। দক্ষিণ কলকাতার জেলা লিগে খেলা ছাড়া আন্তঃজেলা স্কুল ফুটবলে স্কুলের অধিনায়কত্ব ও করেছে। এবছর নাকতলা হাই স্কুল থেকেই বানিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। হাসিখুশী লাজুক টাইপের এই ছেলেটির বাড়ির অবস্থা মেটেই ভাল নয়। বাবা অমূল্যরঞ্জন ঘোষ আগে ছোটখাট ব্যবসা করতেন। এখন বয়স হওয়ায় বাড়িতেই থাকেন। ফলে ১৫ জনের পরিবারের দৈনন্দিন খরচা চালাতে হয় বাড়ীর মেজছেলে প্রদ্যোৎ ঘোষের। মেজ ছেলে প্রদ্যোৎ এক সময় ভ্রাতৃ সংঘের গোলকিপার খেলতেন। খেলার সুবাদেই আয়কর বিভাগে চাকরি করেন। শত অভাব থাকলেও প্রদ্যোতের উৎসাহে ও সুধীর কর্মকারের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলতে বাড়ির ষষ্ঠ সন্তান পংকজ ভাল খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

সন্দীপ দত্ত

ওসমান শিল্ড জিতল আসাম পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ডিব্রুগড় (আসাম): এই জেলার উল্লেখযোগ্য ফুটবল টুর্নামেণ্ট জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ওসমান শিল্ড ফুটবলে এবছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আসাম পুলিশ ২—০ গোলে কোল ইণ্ডিয়াকে পরাজিত করে। ১ থেকে ১৬ জুন অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেণ্টে আসামের বিভিন্ন প্রান্তের ১৬টি দল অংশ নেয়।

ওসমান শিল্ডের আসরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আসামের নানা প্রান্ত থেকে বিখ্যাত ফুটবল দলগুলো ওসমান শিল্ডে অংশগ্রহণ করে। শেষ মুহূর্তে গত বছরের রানার্স মণিপুর ইয়ং ফিজিক ইউনিয়ন, মণিপুর পুলিশ এবং ২য় আসাম পুলিশ ব্যাটেলিয়ন প্রতিযোগিতার থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আকর্ষণ কিছু পরিমাণে কমে যায়।

উল্লেখযোগ্য, এই প্রতিযোগিতার শুরু ১৯২৩ সালে।

জুন মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত এবারের টুর্নামেণ্টের খেলাগুলোর মান খুব উচ্চদরের না হলেও কিছু সংখ্যক খেলোয়াড় তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে দর্শকদের মন জয় করতে পেরেছেন—যেমন, আসাম পুলিশের গোলরক্ষক লোহিত কাকতি, স্টপার ব্যাক সুবীর চৌধুরী, স্ট্রাইকার গিলবার্টসন সাংমা; কোল ইণ্ডিয়া দলের স্টপার মোহন দত্ত, লিংকম্যান ঘনশ্যাম গগৈ: ডিব্রুগড় টাউন ক্লাবের স্ট্রাইকার ফিলিক্স পিনারো আর অয়েল ইণ্ডিয়ার পরেশ কাকতি; সেমিফাইনালে আসাম পুলিশের বিরুদ্ধে পরেশ কাকতির অনবদ্য ক্রীড়া নৈপুণ্য বহুদিন মনে থাকবে। অভিজ্ঞ প্রাক্তন আসাম রাজ্যক ফুটবল দলের অধিনায়ক অয়েল ইণ্ডিয়ার অরুণ বরঠাকুরের খেলায় আগের জৌলুস আর নেই—তার গতি যথেষ্ঠ মন্থর আর দমেরও অভাব রয়েছে বলে মনে হল।

১৬ জুন বিপুল জনসমাগমে ফাইনাল হল আসাম পুলিশ ও গতবছরের বিজয়ী কোল ইণ্ডিয়া দলের মধ্যে। আসাম পুলিশ ২—০ গোলে কোল ইণ্ডিয়া দলকে পরাজিত করে ১৯৭৯ সালের ওসমান শিল্ড জিতল।

ফাইনাল খেলার পূর্বমুহূর্তে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আসামের অর্থ ও ক্রীড়ামন্ত্রী কেশবচন্দ্র গগৈর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং খেলার শেষে তিনিই পুরস্কারগুলি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন।

সুষ্ঠুভাবে এই প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালনা করেছেন বাবুল বার্মিজ, উৎপল ভট্টাচার্য প্রমুখ সর্বভারতীয় রেফারিরা। ●


Cadbury's
MILK CHOCOLATE
Cadbury's
Caramello
MILK CHOCOLATE
Cadbury's
CRACKLE
MILK CHOCOLATE
CADBURY'S CRACKLE MILK CHOCOLATE
প্রকৃতির সব সেরা জিনিসে ভরপুর
খাঁটি দুধের প্রকৃত স্বাস্থ্যগুণ। মিহি জাতের চিনি। অত্যন্ত ভালো জাতের কোকো। এ সবেরই একত্রে সুন্দরভাবে মিশ্রণ, যা একমাত্র ক্যাডবেরীই করতে জানে। যার সুফল হ'ল ক্যাডবেরীস্ মিল্ক চকলেট। এর অপূর্ব স্বাদ কখনো ভোলা যায় না। মোলায়েম। মালাইদার। আলাদা আলাদা ভ্যারাইটিতেও পাওয়া যায়।
প্রত্যেক টুকরোয় দুধের পুষ্টি
Cadbury's
ORANGE
FLAVOURED
MILK CHOCOLATE
Cadbury's
PINEAPPLE
FLAVOURED
MILK CHOCOLATE
Oranjello
MILK CHOCOLATE



কোচ হিসাবে হাকিম নির্দেশ দিচ্ছে ফৌজি দলকে গতবছর জাতীয় প্রতিযোগিতার আগে

আমাদের ফুটবল এশিয়ার সেরা হতে পারে

এস এস হাকিম

মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর সেনাবাহিনীর আমন্ত্রণে ভারতীয় ফৌজি ফুটবল এবং হকি দল সম্প্রতি ওই দুটি দেশে শুভেচ্ছা সফর সেরে এসেছে বেশ কিছু প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে। ওই দুটি দেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় করার জন্য এই সফর। ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের সেরা কোচ রহিম সাহেবের পুত্র—যিনি রোম ওলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন, সেই সৈয়দ শাহিদ হাকিম গিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের ম্যানেজার হয়ে। সফর শেষে হাকিম এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটি 'খেলার আসর'কে পাঠিয়েছেন।

গত এপ্রিলে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফরে রওনা হবার আগে আমরা খুব বেশি সময় পাইনি নিজেদের তৈরি করার। মাত্র তিন সপ্তাহের যুগ্ম ট্রেনিং নিতে পেরেছিলাম। ম্যানেজার এবং কোচ এম সি পি ও হোথি পুরোপুরি নিযুক্ত ছিলেন দলের ট্রেনিং-এর জন্য। হোথি একজন প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড়।

ভারতীয় দল ২৫ এপ্রিল দেশ ত্যাগ করে এবং ওই দিনই সন্ধ্যায় পৌঁছোয় কুয়ালালামপুরে। আমরা ওখানে পৌঁছে মালয়েশিয়ান আর্মড ফোর্সের দ্বারা উষ্ণ সম্বর্ধনা পেয়েছি।

আমাদের প্রথম ম্যাচ হয় ২৬ এপ্রিল মালয়েশিয়া সিলেকশনের বিরুদ্ধে। তারা এশিয়ান কাপের জন্য বেশ কয়েক মাস ধরে ট্রেনিং-এ ছিলেন। খেলার আগে সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিও হয়েছিল। প্রথমার্ধে দু' পক্ষই সমানভাবে যুঝল। মালয়েশিয়া একটা গোল করেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয়দের অপেক্ষা মালয়েশিয়ানদের দক্ষতা বিস্তার হয়েছিল খেলাটায়। তারা আরো তিনটি গোল করলো। আমাদের দল ওই খেলায় একটা মাত্র গোল দিতে পেরেছিল।

২৭ এপ্রিল আমরা উড়ে গেলাম পেনাং-এ। সেখানে মালয়েশিয়ান রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সঙ্গে আমরা একটি ম্যাচ খেললাম। এখানেও বৃষ্টিতে খেলা হয়েছিল এবং আমরা ৩—৪ গোলে হেরেছিলাম।

পরদিন আবার আমরা কুয়ালালামপুরে ফিরে গেলাম। ২৯ এপ্রিল আমরা সেখানে খেললাম মালয়েশিয়ান আর্মড ফোর্সের বিরুদ্ধে। দলটি বেশ শক্তিশালী ছিল। ওরা সেরা সেরা খেলোয়াড় সংগ্রহ করেছিল আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্স থেকে। আমরা সে খেলায় ওদের হারালাম ২—০ গোলে।

মে মাসের প্রথম দিনেই কুয়ালালামপুর ত্যাগ করলাম এবং পৌঁছোলাম সিঙ্গাপুরে। সেখানে এয়ারপোর্টেই স্বাগত জানাতে ছুটে এসেছিলেন মালেশিয়ান নেভির কর্তারা। ওই দিন সন্ধ্যায় মালয়েশিয়ান নেভির বিরুদ্ধে খেলে আমরা জয় পেলাম ৩—০ গোলে। ৩ মে সিঙ্গাপুর আর্মড ফোর্সের তত্ত্বাবধানে রইলাম। ওই দিন সিঙ্গাপুর আর্মড ফোর্সকে ৩—২ গোলে হারালাম।

কেমন খেললো ভারতীয়রা

ভারতীয় সার্ভিসেস দলের সব কটা খেলা পর্যালোচনা করলে ফল খুব খারাপ হয়নি বলা যায়। মাঠ অত্যন্ত ভিজে থাকায় মালয়েশিয়ান সিলেকশনের বিরুদ্ধে তেমন খেলতে পারেনি। ওইটাই ছিল সফরের প্রথম খেলা। ওই খেলাটা যদি সবশেষে খেলতে পারতাম, তবে আমাদের ফল আরো উন্নত হতোই। সবচেয়ে খারাপ খেলেছে ভারতীয়রা একটা ম্যাচেই। সেটা মালয়েশিয়ান রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বিরুদ্ধে। আসলে দলটা ছিল খুবই দুর্বল। আমাদের ২/৩ গোলে জেতা উচিত ছিল। পরিবর্ত গোলকিপারই মুখ্যত দায়ী ছিল আমাদের পরাজয়ের জন্য। আর সব ম্যাচে আমাদের ছেলেরা ভালো খেলেছে। সফরের সবচাইতে ভালো ম্যাচ খেলেছে ভারতীয়রা দুটোতে। তা হলো মালয়েশিয়ান আর্মড ফোর্স ও সিঙ্গাপুর আর্মড ফোর্সের বিরুদ্ধে। সিঙ্গাপুর আর্মড ফোর্স টিমই গতবছরের স্থানীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন।

ভারতীয়দের মধ্যে রাইট ব্যাক বিশ্বাস, গোলকিপার চক্রবর্তী, স্টপার শার্দুল সিং, হাফ ভাস্করণ এবং ফরোয়ার্ডস সুব্রহ্মনিয়ম ও সরকার ভালো খেলেছে। দেশের ফুটবল কর্তাদের নজরে পড়লে ভাস্করণ ও সরকারের মতো খেলোয়াড়রা ভালো মানের খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ওদের মান কেমন

মালয়েশিয়ানদের সঙ্গে ভারতীয়দের তুলনামূলক বিচার করলে আমাকে অবাক হতে হয় যে, কি করে আমাদের জাতীয় দল বিদেশে ব্যর্থ হয়? বিশেষ করে হাবিব, সুরজিত, গৌতম, নিকোলাস পেরেরা, ডি সুজা, আকবর, চিন্ময়, হরজিন্দার, গুরদেব প্রমুখের মতো খেলোয়াড় থাকতে! আমাদের আরও ভালো ফল করা উচিত। স্কিলের দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনা করা যায়। আমাদের প্রধান ঘাটতিগুলো হলো বল ছাড়াও মুভমেণ্ট করতে না পারা, ডিফেণ্ডারদের মধ্যে ঠিক সময় ঠিক স্থান গ্রহণ করার অক্ষমতা, গোলের সুযোগের সদ্ব্যবহার করা এবং দলীয় সংহতি এবং জয়ের বাসনা, এইসব ঘাটতি পূরণ করতে পারলে আমাদের ফুটবল আবার এশিয়ায় সেরা হতে পারবে।

খেলার-হাওয়া

শ্যাম বন্দোপাধ্যায়

কর্তার দল—'মোহনবাগান,'—
'ইস্টবেঙ্গল' গিন্নীর ;
যে যার দলের কল্যাণে তো—
মানত করেন সিন্নি'র।

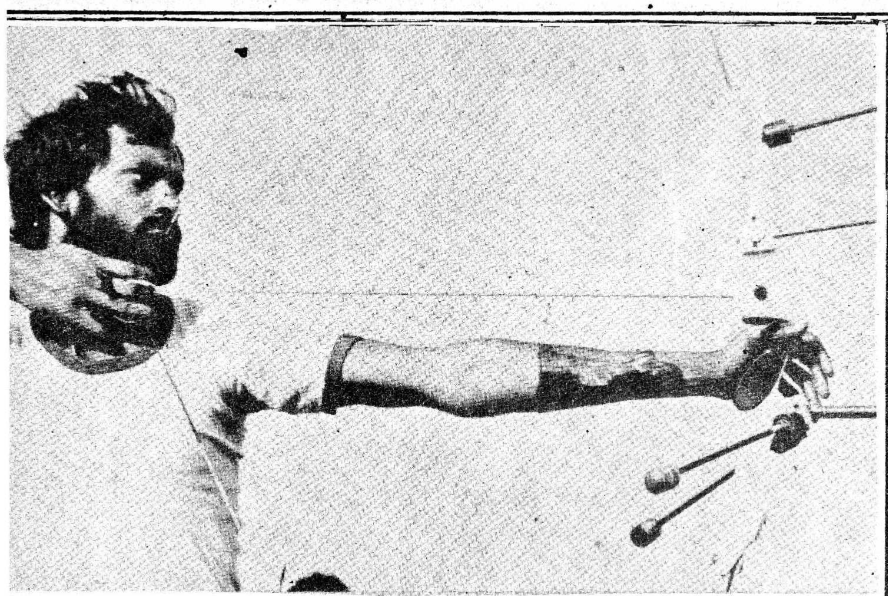
খেলার ঠেলায় মানত চলে,—
ঠাকুর ঘরে ধর্না ;
গিন্নী পেলেন এক সাকরেদ,—
নিজের ছোট কন্যা।

বড় কন্যা বাবার দলে,—
মাতায় বাড়ী ফুটবলে ;
বাকী দুজন, বাড়ীর চাকর,—
এবং মেজো পুত্র ;
কোন দলে ঠিক সুবিধে হয়,—
খুঁজছে তারই সূত্র !

জিতলে পরে, কর্তা যেমন—
গিন্নীকে খুব রাগান,
গিন্নী তেমন, কাঁচা ঘুমেই—
কর্তাটিকে জাগান ;
কারণ, উনি ইস্টবেঙ্গল,—
কর্তা মোহনবাগান !

খেলা নিয়েই বেলা কাটে,—
কত কী যায় হারিয়ে ;
খেলার-হাওয়া ঘূর্ণি তোলে,—
সব কিছুকে ছাড়িয়ে !





তিনটি নতুন রেকর্ডের অধিকারী চ্যাম্পিয়ন তীরন্দাজ চন্দ্রকুমার দাস

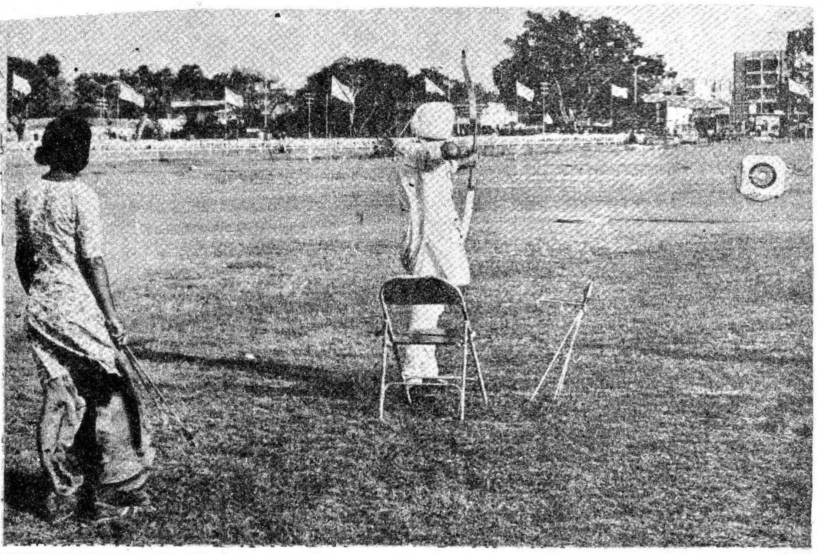
জাতীয় তীরন্দাজিতে এত রেকর্ড হলেও গৌরবের কি !

সেকেন্দ্রাবাদ থেকে শ্রীবিকাশ ঃ ৩১ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত সেকেন্দ্রাবাদে পঞ্চম জাতীয় তীরন্দাজিতে আবার প্রমাণ হল বাংলার তীরন্দাজী মানেই ভারতীয় তীরন্দাজী। বোঝা গেল ভারত আন্তর্জাতিক মান তো দূরের কথা এশিয় মানেরও ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি এবং তীরন্দাজীকে জনপ্রিয় করে তুলতে নানাভাবে সচেষ্ট হতে হবে অবিলম্বে।

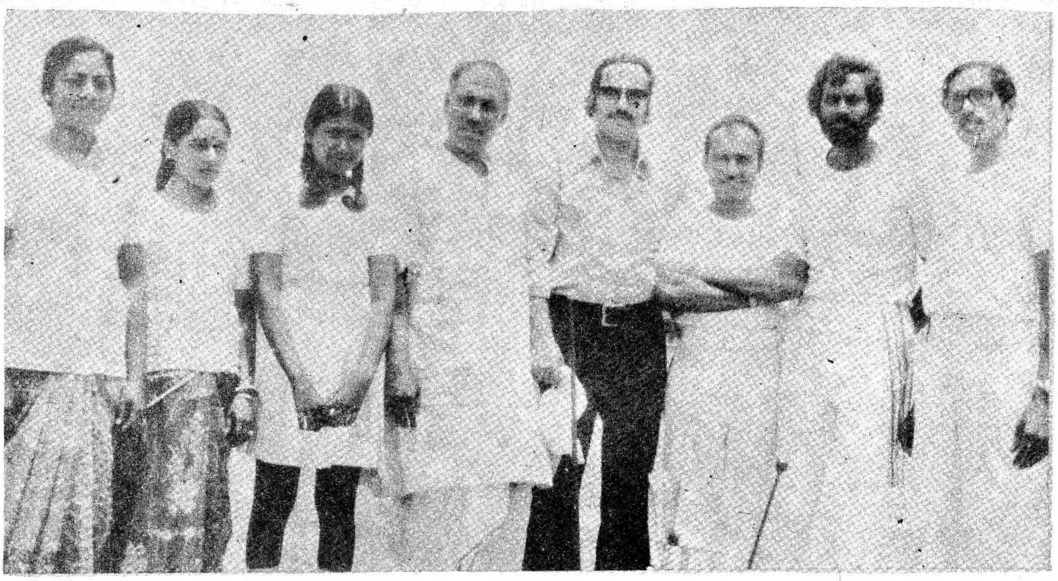
রাইফেল স্যুটিংয়ের মতই সময় সাপেক্ষ তীরন্দাজীর আসরে সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে হলে ভারতে বসেই উন্নত মানের তীর ধনুক প্রাপ্তির ব্যবস্থা যেমন চাই, তেমনি চাই আর্চারি কর্তাদের বন্ধুসুলভ আমন্ত্রণমূলক ব্যবহার। সেই সঙ্গে তীরন্দাজী একটি অন্যতম 'রয়াল গেম' এই মানসিকতা খেলোয়াড়দেরও বর্জন করতে হবে। আজকের ফাইবার গ্লাসে তৈরি ধনুকে টার্গেট দেখার উন্নত ও সহজ, সরল যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। সেই সঙ্গে আছে বাঁশ বা কঞ্চির তৈরি তীর থেকে অনেক নিখুঁত অ্যালুমিনিয়ম অ্যালয়ের তৈরি আধুনিক তীর। টার্গেটও আগের দিনের শত্রু সৈন্য বা ধূর্ত শিকারের মত ধাবমান নয়। রীতিমত সিটিং টার্গেট। তবু টার্গেট তার 'বুল আই'য়ে বিশেষ কোন খোঁচা খায় না। আধুনিকতার প্রবর্তনেই রয়ালশিপ বাড়ে একথা মানা যায় না। মেঘালয় থেকে যারা সেকেন্দ্রাবাদে এসেছিল তাদের সঙ্গে ছিল ঐতিহ্যবাহী তীর ধনুক। অথচ তারাই প্রমাণ করে গেল তীরন্দাজীকে এখনো 'বোর গেম'-এর অপবাদ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। বেঁটে খাটো মানুষগুলো কোমর থেকে বাকি দেহটা ৭৫ ডিগ্রী মাপে বাঁকা করে যেভাবে মাত্র ৫ সেকেণ্ডের মধ্যে একটি তীর ছুঁড়ে আরেকটা ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয় তা আধুনিক তীর ধনুকধারী উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তীরন্দাজদের নিশানা ভেদ করার গাণিতিক ভাবভঙ্গির জন্য সত্যিই কিছু শিক্ষণীয়।

সংবাদ সরবরাহের পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা ভারতীয় তীরন্দাজ সংস্থা করে উঠতে পারেনি। সংগঠন কর্তাদের অত্যধিক কর্তাগিরি আসরকে অন্তত দুবার অ-বন্ধুসুলভ করে তুলেছিল। 'কিটা'র অন্যতম সদস্য ভারত সাধারণত 'কিটা'র নিয়ম কানুনই মেনে থাকে। পাঞ্জাব দলের ম্যানেজার খোঁজ পেলেন কয়েকটি নিয়ম নাকি রাতারাতি বদলে গেছে। তাই তিনি সভাপতি মেহেরার কাছে এই নিয়ে লিখিত বিবরণ চান। মেহেরা কোন রকম প্ররোচনা ছাড়াই বলে দিলেন ওসব কিছু দেয়া হবে না—আপনি ইচ্ছে করলে উইথড্র করতে পারেন। আমি একই তাঁবুতে বসে ব্যাপারটা আগাগোড়া লক্ষ্য করেছি। মেহরার অগণতান্ত্রিক মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে পাঞ্জাব দলের ম্যানেজার তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিলেন। বাদানুবাদ প্রথমে ভদ্র ইংরেজি, পরে চলতি হিন্দি ও শেষে নিকৃষ্ট পাঞ্জাবি ভাষায় পৌঁছে ঠিক হাতাহাতির ফটো ফিনিসিংয়ে গিয়ে থামল। পরে জানলাম ভারতীয় তীরন্দাজী সংগঠনেও দলাদলির ঘৃণ্য অভিশাপ রাজত্ব করছে অন্যান্য যে কোন ক্রীড়া বিভাগের মতই। বাংলা দলের কিছু প্রতিযোগীর মধ্যেও যে 'আমি আছি আর মশাই মাত্র আপনি' ধরনের মানসিকতাও যে বর্তমান তা খেলোয়াড়দের পরস্পর বিরোধী আচরণই বলে দেয়। জানলাম ফাউণ্ডার সেক্রেটারিই নাকি ক্লাবে প্র্যাকটিস করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি নতুন রেকর্ড হয়েছে যার কটি উঠেছে বাংলার ঝুলিতে। গৌরবের কথা, কিন্তু সুখের কি? নিকটতম মাপের নতুন রেকর্ড কখনই চমক আনে না। বড়দের মধ্যে চন্দ্রকুমার দাস একনিষ্ঠ একাগ্রতা দেখিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে তিনটি নতুন রেকর্ড করেছেন। মোট পয়েণ্ট পেয়েছেন ১০৫৭। উনি যেভাবেই হোক বিদেশে উচ্চ ও বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও আছে। আমরা কি আরো বেশী কিছু আশা করব না? কৃষ্ণা দাসও তার সাধারণ নজির



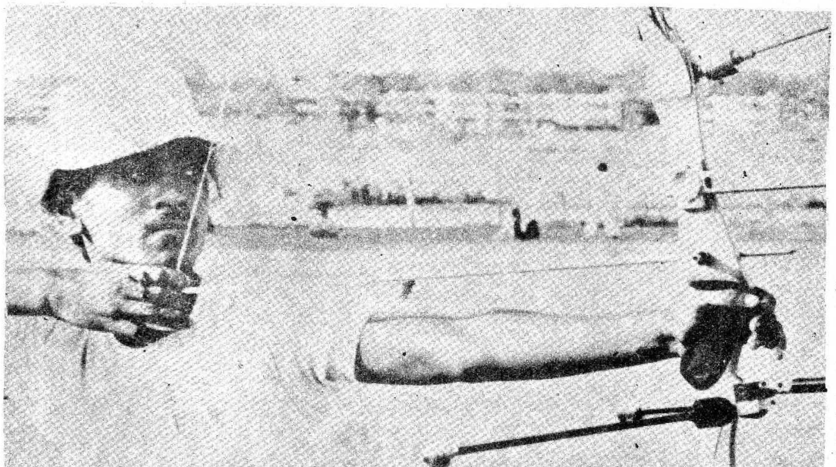
মেজর মৌলিন মেয়ের নির্দেশে তীর ছুঁড়ছেন, টার্গেট ভালভাবে না-দেখেও



তীরন্দাজীতে ভারতীয় দল—বাঁদিক থেকে—পূর্ণিমা দাস, ভারতী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা দাস, অসিত বিশ্বাস (কোচ), এম এ কামাল (ম্যানেজার), শিশির দাস, ধনপতি ঘোষ

থেকে বেশ নীচে নেমে এসে পয়েন্ট করেছেন মাত্র ৮৮৮। বড়দের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে কাউকেই মরিয়া হয়ে লড়তে দেখা যায়নি। বড়দের বিজয়ীদের পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী এখন মঙ্গোলিয়ায় থাকার কথা। তারপরের মাসে যাবে বার্লিনে। হয়তো এই ধরনের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আরো হবে। তাতে ভারতীয় তীরন্দাজীর উন্নতি কতটুকু হবে, তা নির্ভর করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের সচেনতার উপর।

ছোটদের উপর কিন্তু সত্যি আশা রাখা যায়। ম্যানেজার নামে পরিচিত প্রবীর দাস মাত্র ১৬ মাস আগে তীর ছুঁড়তে শুরু করে আজ সে সারা দেশের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন। সেকেন্দ্রাবাদে দু'টি নতুন রেকর্ড করেছে সে, নিজেরই রেকর্ড ভেঙে। অর্থাৎ সে উন্নতি করছে। ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিলেই জানা যায় ছেলেটি তীরন্দাজিতে কিছু একটা স্থান করে নিতে সত্যি উৎসুক। জুনিয়র মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন স্মিতা দত্তরায়ও প্রতিভা রাখে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার অবসরে সেকেন্দ্রাবাদে আসার আগে মাত্র ১৫ দিন অনুশীলনের সুযোগ ছিল। তাতেও দুটো স্বর্ণপদক। পাঞ্জাবের তিনটি মেয়ে দলীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তার সঙ্গে স্মিতা দত্তরায়ের একার সংগৃহীত পয়েন্টের বিশেষ ব্যবধান ছিল না। এর আগে বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত জুনিয়র প্রতিযোগিতায়ও সে পেয়েছিল দুটি স্বর্ণপদক। সব থেকে আশ্চর্যের স্মিতার নিজস্ব কোন তীর ধনুক নেই। ধার করে প্রতিযোগিতায় নেমেও চার চারটি স্বর্ণপদক এ পর্যন্ত যোগাড় হয়েছে। প্রবীর ও স্মিতার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে উচ্চস্তরের কোন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করার দরকার। জুনিয়রদের উপর শুধু খবরদারি না করে যদি উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া যায় তবে দেশের পক্ষে মঙ্গল। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ চেস্ট নাম্বার নেওয়ার জন্য জুনিয়রদের অফিসিয়াল তাঁবুতে ডাকা হয়। কাঁচ ছেলে মেয়েগুলি তাঁবুতে পৌছুলে কর্তৃপক্ষের মাথায় কি ঢোকে কে জানে, হঠাৎ তাদের নিয়ে 'লেফট-রাইট, ডাইনে মোড়-বাঁয়ে মোড়' ধরনের প্যারেড শুরু করে দেয় আদ্র হাওয়ায় ওই কড়কড়ে রোদে। এই নিয়ে অবশ্য বাংলা দল তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। শান্ত ধরনের মানুষ চন্দ্রকুমার দাসও ক্ষেপে লাল হয়ে গিয়েছিলেন।



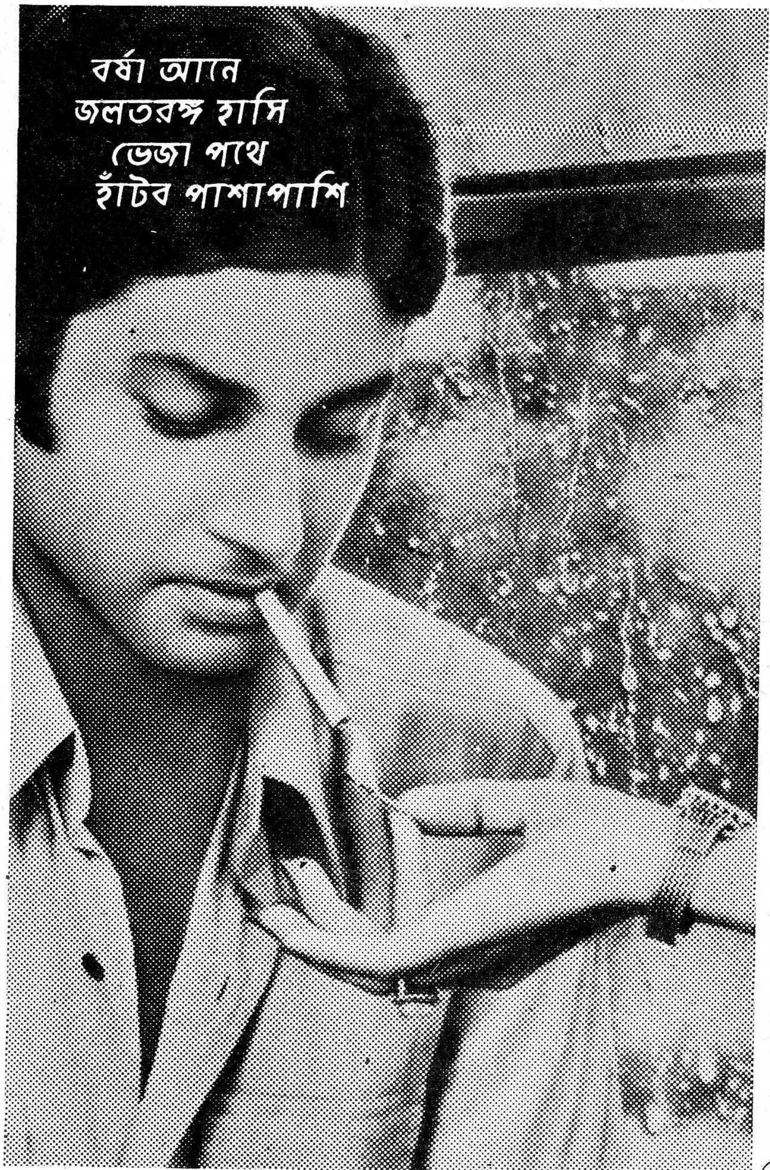
তীরন্দাজীতে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন প্রবীর দাস

আশা করা হয়েছিল দিল্লি ও পাঞ্জাব থেকে শক্তিশালী দল আসবে সেকেন্দ্রাবাদে। দিল্লির কে একজন অজ্ঞাত মেজর তীরন্দাজ শেষ মুহূর্তে এসে আসর মাত করবেন এমন একটা খবর স্থানীয় পত্রপত্রিকায় শেষ পর্যন্ত প্রচার হয়েছে। তেমন কেউ আসেননি। মহারাষ্ট্র থেকে যারা এসেছিলেন তারা না এলেও পারতেন। একটা তীরও টার্গেটে লাগেনি।

দলগত পয়েন্ট এরকম: (পুরুষ বিভাগ) পশ্চিমবাংলা—৩০৩০/৪৩২০, দিল্লি—১৮৫৯, মেঘালয়—১৭৩, অন্ধ্রপ্রদেশ—৮০৬, মণিপুর—৪৪৭, পাঞ্জাব—৩৪৬, চণ্ডীগড়—২৯৮ ও হরিয়ানা—২৫৬। **(মহিলা বিভাগ)** পশ্চিমবাংলা—২৪৬২, দিল্লি—৮১৪, পাঞ্জাব—৪৩৬, মণিপুর—৩০৩ এবং চণ্ডীগড়—২৫৮।

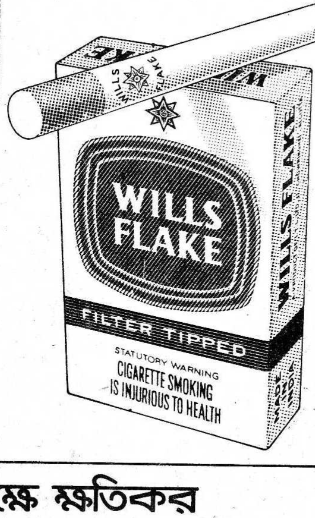
এবারের প্রতিযোগিতায় সব থেকে বয়স্ক প্রতিযোগী ছিলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মেজর ৭৩ বছর বয়স্ক আর এস ধীলন। ভদ্রলোকের চোখ ও পা দুটি খুব উপযোগী নয়। দাঁড়াতে গেলেও হাঁটু বেঁকে থাকে। টার্গেটটি ঠিক কোথায় তা বলে দিতে হয় কন্যাকে। অথচ প্রচণ্ড তার উদ্যম। তিনি জোর দিয়ে বললেন তীরন্দাজী শুধু দেহ নয় মনের জন্যও নিখুঁত ব্যায়াম। মেজর ধীলন আরো বললেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অসুস্থ হয়ে পড়লে হুইল চেয়ারে বসেই তীরন্দাজী করতেন।

সেকেন্দ্রাবাদের ছবিগুলি পাঠিয়েছেন শ্রীবিকাশ



এমন দিনে চাই স্বাদে ভরা, মনের মতো সিগারেট

রোদে-পাকা সোনালী ভার্জিনিয়া
তামাক—পাকা হাতে ব্লেণ্ড করা
তাই প্রতি টানে দেয় তৃপ্তি।
আর সঙ্গে রয়েছে উপযুক্ত ফিলটার,
সব স্বাদটুকু যুগিয়ে দেয়।



WFF 9382-3

উইল্‌স ফ্লেক

আজকের দিনের স্বাদে ভরা সিগারেট

এখন টা: ১·৫০ পয়সায় ১০ টি

সর্বাধিক দাম, স্থানীয় কর সাপেক্ষ

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH



ব্যারাকপুরে অনুষ্ঠিত আন্তজেলা হকি প্রতিযোগিতায় যুগ্মবিজয়ী
হুগলি ও বর্ধমান জেলার ছেলেরা / শ্রীধর কুণ্ডু



আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের উপহার : মহম্মদ আলী নিজের সৃষ্ট
একটি ছবি (জাতিসংঘের সদর দপ্তরের প্রতিকৃতি) তুলে দিচ্ছে
সেক্রেটারী জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহামের হাতে



আন্তজেলা খো খো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ২৪ পরগণার মেয়েরা

সংবাদ-চিত্র

পুনেতে সর্বভারতীয় কবাডি প্রতিযোগিতায়
মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম বাংলার অশোক
সংঘ (নতুন বাজার)। বাঁদিক থেকে—ধীরা দাস, গৌরী মজু
টুলু পাল, মণিকা নাথ (অধিনায়িকা) ও অনিতা ভাওয়াল। (
সীমা দেবনাথ, শিবানী দত্ত,
মমতা দাস ও অনিতা দাস

প্রবীণদের (ভলিবল) বিচারে বছরের সেরা ভলিবল খেলোয়াড় তাপস দে (হাওড়া
ইউনিয়ন) ও সুমিতা দেব (সালকিয়া অ্যাসোসিয়েশন)





ইংল্যাণ্ড যেদিন ধ্বংস হল

লণ্ডন থেকে সুব্রত সরকার

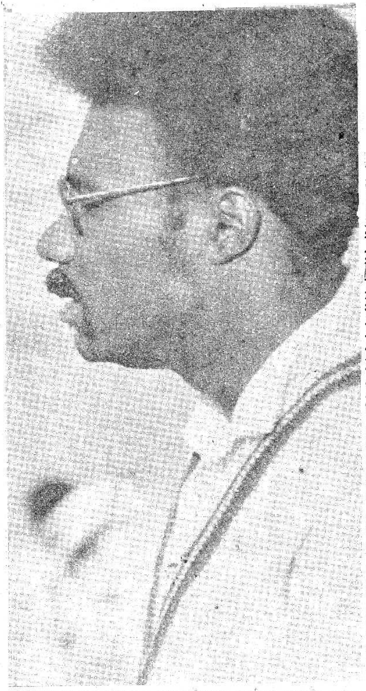
প্রুডেনশিয়াল কাপের ফাইনালটি ছিল ২৩ জুন শনিবার। লর্ডসে সেদিন ২৬০০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন দেখতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছ থেকে ইংল্যাণ্ড কাপটি কেড়ে নিতে পারে কিনা। ক্রিকেট খেলার ফল কি হবে অনেক সময় আগেই বোঝা যায়, বিশেষ করে এই ধরনের ৬০ ওভারের সীমিত খেলায়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথমে ব্যাট করে ৫৫ রানে তিনটি উইকেট হারায়। রান আউট হন গ্রিনিজ, হেইনস ক্যাচ আউট ও কালীচরণ বোল্ড আউট। গ্রিনিজ বিশ্বকাপে অনেক রান পেয়েছেন। কাজেই ডেরেক র‍্যানডাল যখন মিড উইকেটে পাঠান একটি বল হাতে তুলে সোজা বোলারের দিকের উইকেটে ছুঁড়লেন, গ্রিনিজ সময় পেলেন না। অথচ একটু আগেই গ্রিনিজ ঠিক ওই ধরনের রান পেয়েছেন। লয়েডের সঙ্গে ভিভিয়ান রিচার্ডস যোগ দিলেন। ১৯৭৫ সালে লয়েডকে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফাইনালে এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এবারে তফাৎ শুধু ভিভিয়ান রিচার্ডস রয়েছেন। রিচার্ডস শুরুতেই পেটাতে শুরু করলে লয়েড কাছে এসে সাবধান করে দেন। কিন্তু রিচার্ডস জবাবে বয়কটকে ওভার বাউণ্ডারী পাঠালেন। পরের বলে স্কোয়ার দিয়ে একটা বাউণ্ডারি, এরপর লয়েড নিজে ক্রিশ ওল্ডের হাতে ক্যাচ আউট হয়ে গেলেন।

রিচার্ডস কিছুক্ষণের জন্য মনে হল শান্ত হয়েছেন। কিন্তু কলিন কিং বলে একজন এলেন যার কাছে বোলারদের সমীহ করার ব্যাপারটা প্রায় অজানা। ৯৯ রানে চার উইকেট পড়েছে। কিং আর রিচার্ডস মার



গর্ডন গ্রিনিজ বিশ্বকাপেও অনেক রান পেয়েছেন



পরপর দুবার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লয়েড/সমর তরফদার

শুরু করে বেপরোয়া কথাটাকে পর্যন্ত খাটো করে দিলেন। কিং ইয়ান বোথামকে বাউণ্ডারি পাঠালেন উইকেটকিপারের মাথার ওপর দিয়ে। ব্যাপারটা বিসদৃশ হলেও কিং আংশিকভাবে তার ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়েছিলেন বলা যায়।

দুদিক দিয়ে রান উঠতে লাগল ঝড়ের গতিতে। ক্রিকেটের এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা হচ্ছে। কিং আর রিচার্ডস ২১ ওভারে ১৩৯ রান তুললেন। এদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের গ্রাহাম গুচকে তুলনা করা যায়। ইংল্যাণ্ড তখনই হেরে গেল ফাইনালে। রিচার্ড ও কিং ছয় আর চার বাউণ্ডারিকে জলবৎতরলম করে ছাড়লেন। বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে হেনস্থা হলেন গুচ আর লারকিন্স। তারা আগে সেরকম বল করার সুযোগ পায়নি। লারকিন্সকে কানাডার বিপক্ষেও বল করতে দেওয়া হয়নি। এখন অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি লারকিন্সকে বাঘের মুখে ছুঁড়ে দিলেন। কিং আর রিচার্ডস-এর চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। বয়কট এসেও প্রচণ্ড মার খেলেন। এমনকি রিচার্ডস বয়কটের এক ওভারে ১৫ রান পেলেন। মধ্যাহ্ন ভোজেরপরের ১৬ ওভারে ১১৬ রান সীমিত ওভারের খেলায়। কিং ৫০ রান করে আউট। রিচার্ডস সেঞ্চুরি করলেন। শেষ দশ ওভারের খেলায় ইংল্যাণ্ড স্বস্তি পেল। মারের একটি মাত্র রান ছাড়া আর কেউ রান করতে পারলেন না, রিচার্ডসকে সাহায্য করতে বাকিরা ব্যর্থ হলেন।

ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শুরু করেন ব্রিয়ারলি ও বয়কট। ১২৯ রান হল রাজকীয় মহিমায়, অর্থাৎ পাঁচদিনের টেস্ট খেলায় যে রকম হয়ে থাকে। ১৭ ওভারে ৫০ রান, ৩২ ওভারে ১০০। আরও সাত ওভার খেলার পর জুটি ভাঙল। কিন্তু ইংল্যাণ্ড তখন হেরে গেছে। বয়কট হেলমেট পরে ৫০ রান করলেন। ব্রিয়ারলিও ৫০ রান পান।

হোল্ডিংকে হুক করতে গিয়ে বয়কট ও ব্রিয়ারলি পরপর দু'ওভারে আউট হওয়ার পর র‍্যানডাল ও গ্রাহাম গুচ লড়াইতে নামেন। গুচ বেশ ভালরকম পেটালেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। তখন ৪৮ ওভার খেলা হয়েছে। গার্নার এসেছেন। ইংল্যাণ্ডের ইনিংস ধ্বংস হয়ে গেল।

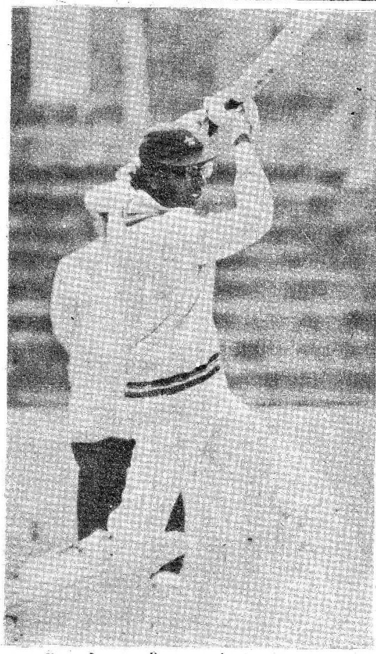
প্রথমে গুচ, তারপর গাওয়ার ও পরে লারকিন্স প্রথম বলেই। বাকি ছিলেন ইয়ান বোথাম। রিচার্ডস-এর হাতে লং-এ ক্যাচ আউট হলেন। দেখা গেল শেষ আটজন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন ২৫টি বলে; রান পেয়েছেন মাত্র ১২। গার্নার পাঁচটি উইকেট একাই তুললেন। দুবার পরপর দুটি বলে উইকেট-পান তিনি।

জাহিরকে বেশী ভাল লাগল

ইংল্যাণ্ডের কাছে হারার ফলে পাকিস্তানকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে প্রুডেনশিয়াল কাপের সেমিফাইনাল খেলতে হলেও জাহির আব্বাস ও মজিদ খান জুটি যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন ততক্ষণ কে জিতবে সেদিন বলা সম্ভব ছিল না। জাহিরের ৯৩ রান ক্রিকেটে এক অনবদ্য ও অসাধারণ ইনিংস। জাহিরের খেলার স্টাইল ও মানসিক দৃঢ়তা মনে রাখার মত, যেমন আমরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস বোলারদের কথা মনে রাখি। দশ রানের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম উইকেট পড়ে যায়। তাদের প্রতিপক্ষ রান করেছে ২৯৪।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গর্ডন গ্রিনিজ আবার 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার পেলেও কলিন ক্রফট ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের পথ প্রস্তুত করেন। পাকিস্তানের এক উইকেটে ১৭৬ রান থেকে চার উইকেটে ১৮৭ রান হয়। ক্রফটের ইনসুইং বল লেগ গ্ল্যান্স করতে গিয়ে জাহির উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুললে ডেরিক মারে শুয়ে পড়ে ধরেন। এরপর জাভেদ মিঁয়াদাদকে প্রথম বলেই এল বি ডব্ল্যু এবং মজিদ ক্রফটের বলে কভারে সহজ ক্যাচ তোলেন।

ক্লাইভ লয়েড পাকিস্তানের ব্যাটিং শক্তিতে ভয় পেয়ে আগেই ভিভিয়ান রিচার্ডসকে অন্যদিকে নিয়ে আসেন অফ স্পিন করানোর জন্য। রিচার্ডস ৫২ রানে তিনটি উইকেট আট ওভারে পান। ভিভিয়ানের উরুর



জাহির আব্বাস

পেশীতে টান ধরেছিল। ইমরানের উইকেটটি ভিভিয়ানই অবশ্য পান।

আসিফ ইকবাল ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। সরফরাজ নাওয়াজ ভাল বল করতে পারছিলেন না। বলের গতি ও নিশানা ঠিক ছিল না। যদিও ইমরান প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে বল করেন। গ্রিনিজ ও হেইনেস ব্যাট ধরে স্কোর বোর্ডকে চালু করেন দ্রুত গতিতে। তবে হেইনেসকে একবার ভাগ্য রক্ষা করে যখন মুদাস্সারের বলে ইমরান ক্যাচ ধরতে ব্যর্থ হন। প্রথম উইকেট জুটিতে ১৩২ রান হওয়ার পর আসিফই জোট ভাঙেন। ভিভিয়ান খুব সুবিধে করতে না পারলেও লয়েড শুরু থেকেই মারমুখী ছিলেন। আসিফ চারটি উইকেট পেলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গড়-পড়তা ওভারে পাঁচ রান করে সংগ্রহ করে।

জাহির আব্বাসের খেলার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সাদিক মহম্মদ আউট হওয়ার পর জাহির এসেই হোল্ডিং-এর বাম্পারের মুখে পড়েন। পেস বোলারদের মতলব বুঝতে দেরী হয়নি এবং সময় নষ্ট না করে জাহির হেডগিয়ার চেয়ে পাঠান এবং অচিরেই ফাস্ট বোলারদের মারতে শুরু করেন।

মজিদ সাধারণভাবে মেরে খেললেও জাহিরের খেলাকে সাহায্য করার জন্য কিছুটা ঠাণ্ডা ছিলেন। মজিদ অবশ্য দশ রানের সময় স্লিপে ক্যাচ তুললেও গ্রিনিজ তা মাটিতে ফেলে দেন। জাহির ও মজিদের মারের মুখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে একটা ভীতি সঞ্চার হয়। ৩৬ ওভার খেলার পর ১৬৬ রান হল এবং মনে হল পাকিস্তান ঘড়ির কাঁটাকে ফেলে এগিয়ে যাবে। তখনই ওই দুর্ঘটনা। জাহির হঠাৎ তার মনোনিবেশ করার ক্ষমতায় একটু ঢিলে দিলেন, ভুল করলেন প্রথমবার এবং আউট। পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হল ৫৬.২ ওভারে, ৪৩ রান কম। গ্রিনিজ পুরস্কার পেলেও জাহিরকে আমার বেশী ভাল লাগল। ক্রফট তার তিনটি উইকেট পান ৪ রানে এবং দু'ওভারের মধ্যে।

শ্রীলংকার কাছে হার ভারতীয় ক্রিকেটকে নিচু স্তরে নিয়ে গেল

ম্যাঞ্চেস্টার থেকে

গত কয়েক বছর ধরে ইণ্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সে শ্রীলংকাকে টেস্ট খেলার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার জন্য ওকালতি করে আসছিল। ওই রকম দৃষ্টি নিয়ে দেখলে ভারতের বিপক্ষে শ্রীলংকার জয় খুবই আনন্দের। কিন্তু আবার ওই পরাজয় ভারতের ক্রিকেটের মূল্যমানকে খুবই নিচুস্তরে নিয়ে গিয়েছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও নিউজিল্যাণ্ডের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ার পর এখানকার ভারতীয়রা হাসি ঠাট্টার ছলে বলতে শুরু করেন: এবার শ্রীলংকার কাছেও হার! কিন্তু কেউই নিজেদের কথার গুরুত্ব দেননি। খেলার সময় দেখা গেল তাদের রসিকতাই শেষ পর্যন্ত ফলে গেল।

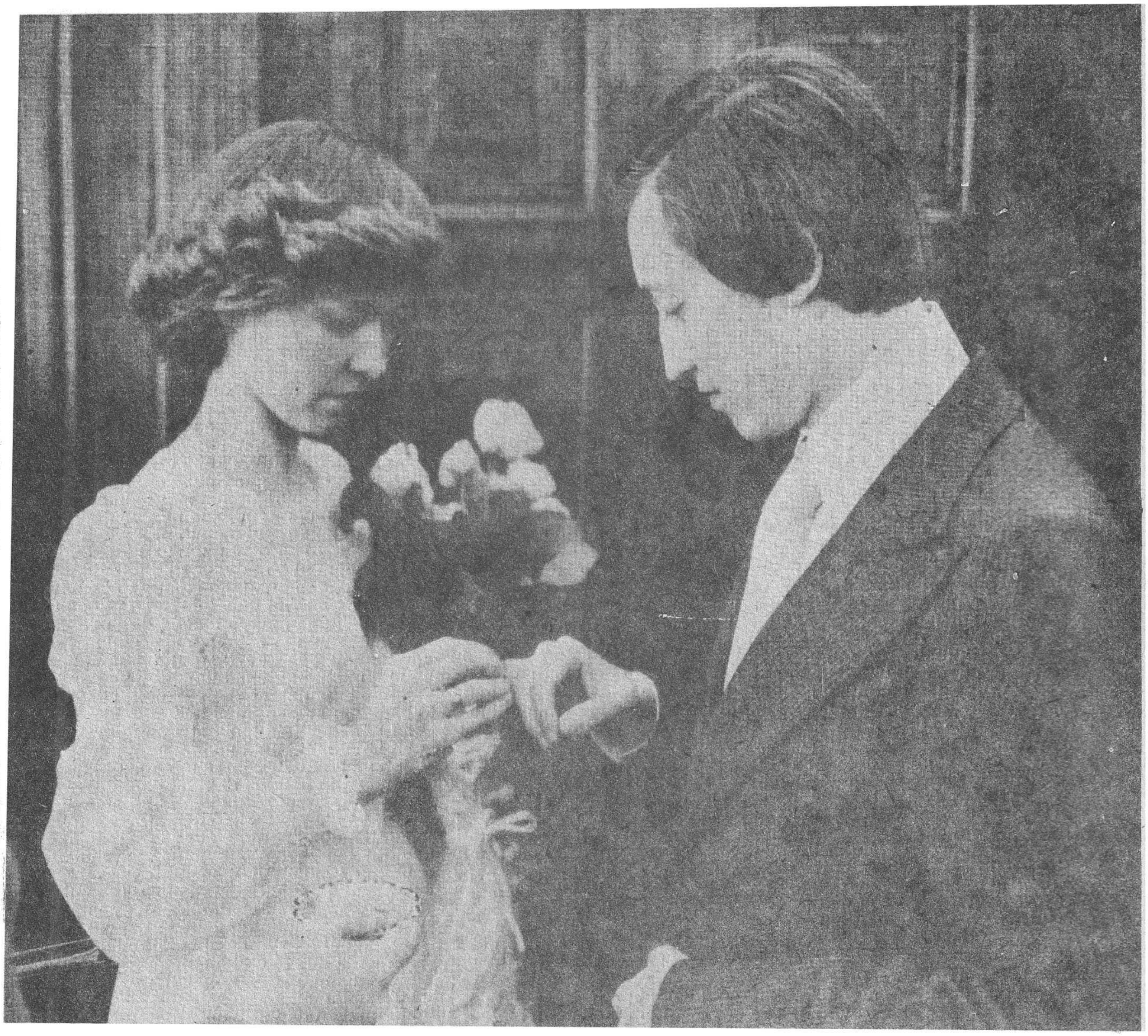
বৃষ্টির জন্য দেরী করে খেলা শুরু হয়। শ্রীলংকা ভাল উইকেটেই খেলার সুযোগ পায় এবং পাঁচ উইকেটে ২৩৮ রান করে। আগের দুটি খেলাতেই ভারত এত রান করতে পারেনি। এর ফলে ওভারে চার রান করতে পারলে শ্রীলংকাকে ভারত হারাতে পারবে। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে দুই উইকেটে ১১৭ রান করল। হাতে থাকল ২৫ ওভার খেলা এবং প্রয়োজন ১২২। বিশ্বনাথ ভাল ব্যাট করছে। কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বিশ্বনাথ রান আউট এবং ভারতের জয়ের আশা বিলুপ্ত হল।

সোমচন্দ্র ডি সিলভা তার লেগ কাটার দিয়ে বেঙ্গসরকর, ব্রিজেশ প্যাটেল ও মহীন্দরকে আউট করল। আর ফাস্ট বোলার টনি ওপাস ভারতের লেজ মুড়িয়ে দিলেন। ভারত ৪৭ রান কম থাকতে আউট হয়ে গেল।

শ্রীলংকার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সুনীল ওয়েত্তিমুনি, ডি আই ভায়াস ও দলীপ মেন্দিস খুব ভাল খেলেন। মহীন্দর তিনটি উইকেট পেলেও সাধারণ ভাবে ভারতীয় ফাস্ট বোলাররা ব্যর্থ হয়েছেন এবং স্পিনারদের পক্ষে এই ধরনের টুর্নামেণ্টে ভাল বল করার সম্ভাবনা খুবই কম।

এই প্রতিযোগিতার একটি ঘটনা ভারতের কাছে মনে রাখার মত। সেটি হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে বিশ্বনাথের ৭৫ রান। সীমিত ওভারের খেলায় ভারতের ব্যর্থতা এবার প্রকট হয়ে পড়ল। অনেকে হয়ত বলবেন যে তিন অথবা পাঁচদিনের খেলা ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক।

ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দিলীপ বেঙ্গসরকর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রান পেলেও খেলার মধ্যে আস্থার ভাব কখনই ছিল না। বিশ্বনাথ ও গাভাসকরই ভারতের প্রধান ভরসা এখনও। তবে গাভাসকর এখনও নিজের খেলায় গতি আনতে পারেননি আর বিশ্বনাথের হঠাৎ করে উইকেট নষ্ট করার প্রবণতা সব সময় চিন্তার বিষয়।



বিশ্বসেরা দাবাড়ু কারপভের বিয়ে—নববধূ ইরিনা। (ইউ এস এস আর-এর তথ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে।)

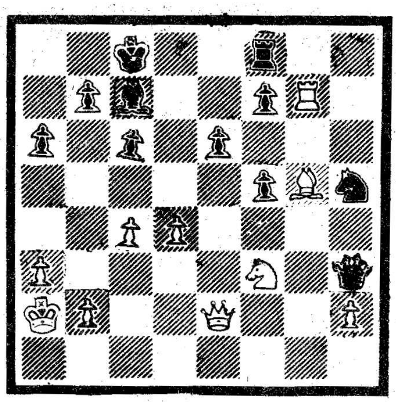
কিস্তিমাত

হিমানীশ গোস্বামী ঃ আজকাল যারা দাবা খেলেন তারা ইম্যানুয়েল, লাসকারের নাম নিয়ে তেমন আলোচনা করেন না। ইম্যানুয়েল ছিলেন দাবার জগতে এক অসাধারণ পুরুষ। জন্ম হয়েছিল বারলিনশোন-এ ১৮৬৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৪ সালে তিনি প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বলে স্বীকৃত স্টাইনিৎজকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন। কেবল তাই নয়, এই খেতাব তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন ১৯২১ সাল পর্যন্ত। ১৯২১ সালে তিনি ক্যাপাব্লাংকার কাছে হেরে যান। ২৭ বছর ধরে বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ এর আগে কেউ রাখতে পারেননি। এর পরেও কারুর পক্ষে তা পারা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে ফিশার-এর একটি কথা স্মরণীয়। ফিশার বলেছিলেন তিনি ত্রিশ বছর ধরে দাবার জগতে রাজত্ব করবেন। তার পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি।

লাসকার ছিলেন সেই যুগের মানুষ যে যুগে ইউরোপেও দাবা খেলে পয়সা রোজগার করা কঠিন ব্যাপার ছিল। অ্যাণ্ডারসনের মত বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষকেও শিক্ষকতা করেই দিন গুজরান করতে হয়েছিল। মরফি অবশ্য দাবা খেলেছেন, কিন্তু দাবা খেলে টাকা পয়সা রোজগারের কথা তার মনে হয়নি। এদিকে দাবা খেলে তখনও কিছু পয়সা রোজগার করা যেত বলে স্টাইনিৎজ তো সমস্ত জীবনই দাবা এবং রুজি রোজগারকে একসঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। এতে দাবা সরস্বতী প্রসন্ন হলেও দাবা লক্ষ্মী তাকে বিশেষ উচ্চাসন দেননি। সেই যুগে অতএব ইম্যানুয়েল, লাসকার কেবলমাত্র দাবা খেলেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন এমন কথা বলা যায় না। অবশ্য তিনি দাবার মত আর কিছুই তেমন করে ভালবাসেননি, তবে তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের দার্শনিক, গাণিতিক, নাট্যকার এবং কবি। দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। চমৎকার দাবা খেলতে শুরু করেন কিশোর বয়স থেকেই। বাইশ বছর বয়সে লণ্ডনে যান এবং তৎকালীন বিখ্যাত খেলোয়াড় ব্ল্যাকবার্নের সঙ্গে ছটি গেম খেলে ছটিতেই জিতে যান। এরপর তিনি যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানেই তিনি চ্যালেঞ্জ জানান স্টাইনিৎজকে। খেলার সর্তে ছিল যিনি প্রথম দশটি গেম জিতবেন তাকেই জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। স্টাইনিৎজ প্রথম থেকেই হারতে শুরু করেন। পরে

কিছুটা উন্নতি করলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য খেলায় স্টাইনিংজ হারলেন। লাসকার জিতে গেলেন ১০-৫-এ, ড্র হল ৪টি। স্টাইনিংজ মনে করলেন ছোকরা তাকে বোধ হয় ঠকিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন। ৫৯ বছরের স্টাইনিংজ-এর সঙ্গে খেলা হল দু'বছর পর। এবারে স্টাইনিংজ আরও শোচনীয় ভাবে হেরে গেলেন। পনেরটি খেলার মধ্যে ১০টিতে জিতলেন লাসকার, আর মাত্র দুটি গেমে তিনি হারলেন। বাকি তিনটি ড্র হল। লাসকার মন্তব্য করলেন, চিন্তাবিদের পরাজয় হল খেলোয়াড়ের হাতে। লাসকার অবশ্য স্টাইনিংজকে তার প্রাপ্য সম্মান দিলেন। তিনি বললেন, ৫৯ বছর বয়সে স্টাইনিংজ যে আমার কাছে এবং পরে অন্যদের কাছে হারলেন তার কারণ তার থিয়োরির কোন ত্রুটি নয়। দাবা সম্পর্কে তার থিয়োরি চিরকালই ধ্রুপদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে।

টাকা তার দরকার ছিল। স্টাইনিংজের মত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে তিনি জীবনটাকে শেষ করতে চাননি। নানারকমভাবে তিনি টাকা উপার্জনের কথা ভাবতেন তবে কোন ব্যবসাতেই তিনি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। তিনি বলতেন, আমাকে যদি কোথাও খেলতে



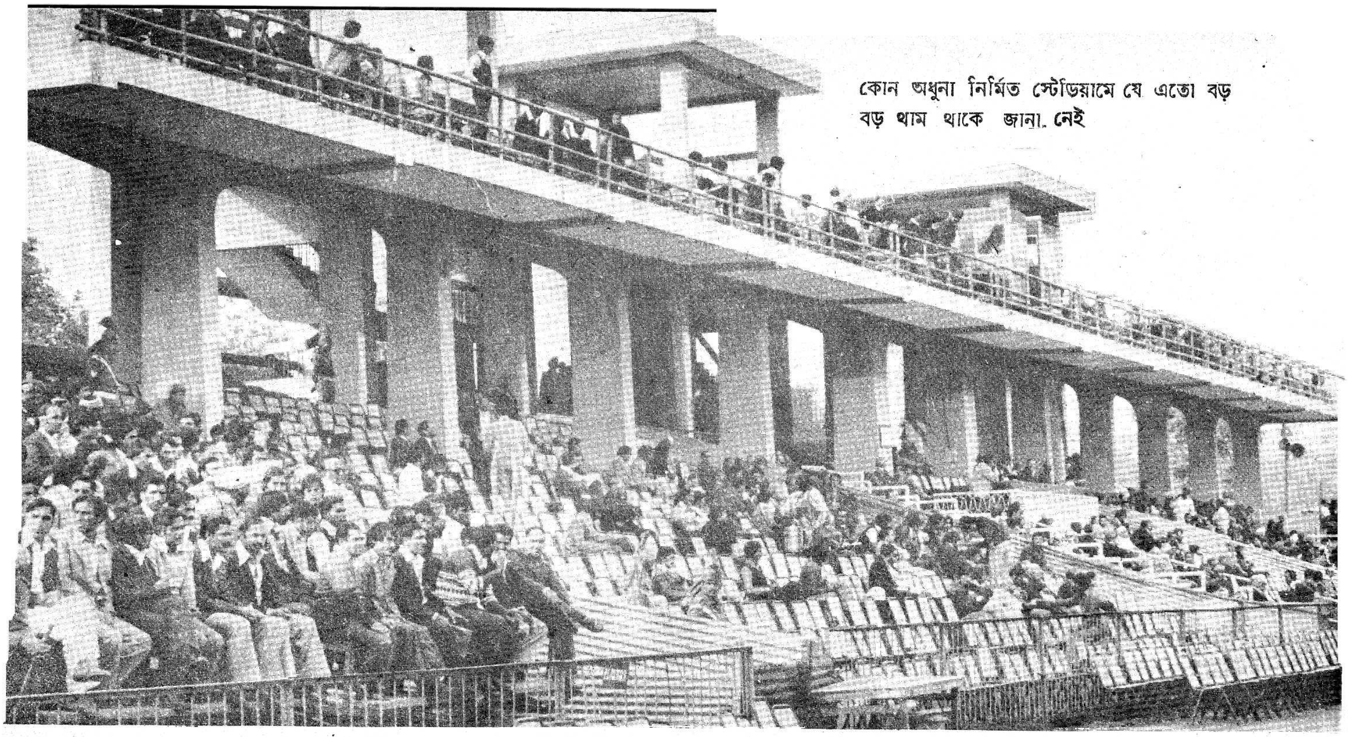
হয় তাহলে আমার সম্মান রক্ষা হয় এমন টাকা দিতে হবে। একবার খেলার জন্য তিনি দু'হাজার ডলার দাবি করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশারের কথাও স্মরণীয়। দুজনেই অবশ্য ইহুদী। দুজনেই অতএব টাকা সম্পর্কে উৎসাহী হবেন এটাই স্বাভাবিক। লাসকার বলতেন, আমার খেলা অন্য কেউ প্রকাশ করতে পারবেন না, ও আমায় কপি রাইট। তার বক্তব্য অবশ্য ধোপে টেঁকেনি। ফিশারও একদা ভেবেছিলেন তার খেলাগুলির উপর তারই একমাত্র অধিকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিশারও এ ব্যাপারে তার মতকে আইনসঙ্গত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

লাসকার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে খেলেছেন। কেউ কেউ মনে করতেন লাসকার যখন খেলতেন, তখন তিনি তার প্রতিপক্ষকে সম্মোহিত করতে পারতেন। অর্থাৎ খেলার এমন একটি জায়গায় পৌঁছে গেছেন তিনি যখন পরাজয় মনে হয়েছে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তিনি ঠিক এমন সূক্ষ্ম চাল বার করে ফেলতে পারতেন যাতে শেষ পর্যন্ত সেই হারা খেলা ড্র করে সকলকে অবাক করে দিতেন।

এখানে ওইরকম একটি খেলা দেওয়া হচ্ছে—

খেলা হচ্ছিল লাসকার (সাদা) বনাম নিমজোভিচ (কালো)। এখানে যে ছক দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পয়েণ্টের দিকে কালো এগিয়ে আছে। এবারে সাদার চাল। সাদার ভাল চাল তেমন চোখে পড়ছে না। কিন্তু এই অবস্থায় লাসকার চমৎকার একটি চাল খুঁজে পেলেন। সেটা হল নৌ×বো! এর উত্তরে নিমজোভিচ খেললেন নৌ×নৌ। তারপর খেলা চলল: ২ নৌ×বো+, নৌ—ম ২; ৩ ঘো—রা ৫, গ×ঘো; ৪ ম—রা ৮+ এরপর খেলাটি ড্র হয়।

শিক্ষার্থীরা যদি লাসকারের লেখা ম্যানুয়াল অফ চেস বইটি যোগাড় করতে পারেন তাহলে খুবই ভাল হয়।



কোন অধুনা নির্মিত স্টেডিয়ামে যে এতো বড় বড় থাম থাকে জানা নেই

বিরাশির এশিয়ান গেমস শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হবে না তো

হায়দ্রাবাদ থেকে হকিকৎ ঃ বিরাশির এশিয়ান গেমস দিল্লির জন্য বরাদ্দ হয়েছে। দেশের বহু নগরীর মধ্যে একমাত্র কলকাতাই ছিল রাজধানীর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর কেউ এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেনি।

অবশ্য একসময় কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর ব্যয়ের দিক চিন্তা করে এদেশে এশিয়ান গেমস-এর অনুষ্ঠানে অমত প্রকাশ করেছিল। পরে অনেক বড় স্বনামধন্য ব্যক্তি, ক্রীড়া—সংস্থাসমূহর অনুরোধে সরকার ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে নবম এশিয়াডের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি দেয়।

অথচ যখন ১৯৭৮-এ অষ্টম এশিয়াডের দায়িত্ব এই মহাদেশের কোন দেশ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল না তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ ওই দায়িত্ব গ্রহণের দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এবারও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানদের নির্দেশেই কলকাতা বঞ্চিত হয়েছে।

ওলিম্পিক, এশিয়ান গেমস অথবা এধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল অনুষ্ঠান করা মোটেই ছেলেখেলা নয়। এজন্য উদ্যোক্তা দেশকে বেশ কয়েক বছরের প্রস্তুতি নিতে হয়, আয়োজক কর্মকর্তাদের দিবারাত্র ঘাম ঝরাতে হয় এবং তারপরই সফলভাবে প্রতিযোগিতা শেষ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

কিন্তু দিল্লির হাল কী? এখানে এখন চারটি স্টেডিয়াম রয়েছে। ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, ফিরোজ শা' কোটলা, ডঃ আম্বেদকর স্টেডিয়াম ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়াম। এছাড়া রয়েছে মডেল টাউনে একটি স্টেডিয়াম এবং তালকোটরা গার্ডেনে ইণ্ডোর স্টেডিয়াম।

১৯৫১-সালে প্রথম এশিয়ান গেমস এই দিল্লিতেই হয়েছিল। দীর্ঘ আঠাশ বছরে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। তাই খেলাধুলোও অনেক উন্নত হয়েছে। একান্নতে যতগুলি দেশ ও প্রতিযোগী এশিয়াডে যোগ দেয় এখনকার সংখ্যার তুলনায় তা ছিল খুবই কম। এমনকি সে সময় প্রতিযোগিতার বিষয়ও ছিল সামান্য সংখ্যক। আজকের দিনে এমন একটি খেলাধুলোর আসর বসানোর জন্য চাই বিশাল উদ্যোগ। যার মধ্যে স্থান নির্বাচন প্রধান।

তবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, যে কোন ব্যক্তি দিল্লির স্টেডিয়ামগুলি দেখার পর আমাদের নির্বাচন নিয়ে বেশ কৌতুক অনুভব করবে। ন্যাশনাল স্টেডিয়াম ছাড়া আর সবগুলিই কেমন যেন জীর্ণ এবং তার ফলে এমন একটি আসরের ধকল সওয়ার শক্তি রাখে না। অবশ্য ন্যাশনাল স্টেডিয়ামও তেমন আহামরি কিছু নয়, বরং এশিয়াডের পক্ষে অনুপযুক্তই বলা চলে।

ফুটবলের জন্য নির্দিষ্ট আম্বেদকর স্টেডিয়াম এমনভাবে তৈরি যা বিশ্বের কাছে স্থাপত্যের একটি নমুনা হিসাবে উপস্থিত করা চলে! একে পৃথিবীর 'নবম আশ্চর্য' বললে বোধহয় কোন প্রতিবাদ হবে না! কোন অধুনা নির্মিত স্টেডিয়ামে যে এতো বড় বড় থাম থাকে জানা নেই। অন্তত আমি দেখিনি। খেলা দেখার জন্য এই থামগুলির পিছনের দর্শকদের নাচ করতে হয়, তাতেও মাঠের বেশ কিছু অংশ দেখা যায় না। উপরের দিকে প্রথম তিনটি সারির আসনে বসলে তো মাঠের মাত্র এক অষ্টমাংশ দেখা যায়। তার নীচে বসলেও পুরো মাঠ দেখা যায় না। ভাগ্যিস, 'ভারতরত্ন' উপাধি দেওয়ার যুগ শেষ হয়ে গেছে, তা না হলে ডঃ আম্বেদকর স্টেডিয়ামের স্থপতি ও এঞ্জিনিয়ারদের ওই উপাধি থেকে কিছুতেই বঞ্চিত করা সম্ভব ছিল না। এখানে শেষ সারির গ্যালারি মাঠের এতো কাছে যে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা বিধান এক বিশেষ সমস্যা।

ফিরোজ শা কোটলা ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে দর্শকাসন খুবই সামান্য এবং দর্শকরা এখানেও যখন-তখন মাঠে ঢুকে পড়তে পারে; সেই নিরাপত্তা সমস্যা।

ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক্স-এর জন্য 'সিণ্ডার ট্র্যাক' আছে। যা এখন অচল। অথচ 'টার্টান' ট্র্যাক আসছে কিনা এখন পর্যন্ত জানা নেই। এতো গেল স্টেডিয়ামগুলির অবস্থা ও দর্শকাসনের কথা। এখন মাঠগুলি কেমনভাবে রক্ষিত হয় দেখা যাক। এখানে

মাঠগুলির পিচ এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, কোন ভাল খেলোয়াড়ই এখানে খেলতে অস্বীকার করবে। রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা এমনই ভয়াবহ। ফুটবলের জন্য নির্দিষ্ট আম্বেদকর স্টেডিয়ামে এবং হকির জন্য লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে 'ভারতশ্রী দখল' থেকে আরম্ভ করে প্রদর্শনী অথবা মেলা লেগেই আছে। এধরনের অনুষ্ঠানগুলির জন্য মাঠ খোঁড়া হয় এবং ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডি সি এম ও ডুরাণ্ডের সময় মাঠে ইঁদুরদের মাটি তোলার দৃশ্য দেখা যায় অহরহ। লজ্জার কথা হলেও সত্যি যে এতবড়ো একটি দেশের রাজধানীতে ফ্লাড-লাইটওয়ালা একটাও স্টেডিয়াম নেই। আর তাছাড়া দিল্লিতে লোড-শেডিং-এর উপদ্রব তো মারাত্মক।

ওখানে কোন অনুশীলনের জন্য পৃথক মাঠ নেই। ডি সি এম, ডুরাণ্ড ফুটবল অথবা নেহরু হকিতে আসা দলগুলির কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া গেটের পাশে ফাঁকা জমিতে প্র্যাকটিস করে।

দিল্লিতে আবাসন একটা বিরাট সমস্যা এটা সবারই জানা। এই সমস্যাটি এমন যার রাতারাতি ফয়সালার কোন সুযোগ নেই। তাই যোগদানকারী প্রতিযোগী, কর্মকর্তা মায় দর্শকদের স্থান সংকুলান হয়ে দাঁড়াবে একটা প্রধান সমস্যা। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে দেশ এধরনের প্রতিযোগিতার দায়িত্ব নেয় বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই আবাসন সমস্যাটির মোকাবিলা করে এবং কমপক্ষে প্রতিযোগিতার এক বছর আগে এ সমস্যার সমাধান করে ফেলে। কিন্তু আমাদের উদ্যোক্তারা এবং সরকার এখন পর্যন্ত কী করেছে জানা যায়নি।

দিল্লির হোটেলগুলি হয় খুব ব্যয়বহুল নতুবা ঘিঞ্জি। মধ্যশ্রেণীর মানুষের ওই শহরে থাকা একটা সমস্যা। তাহলে বিদেশ বা অন্য রাজ্য থেকে আসা দর্শকদের কী হবে?

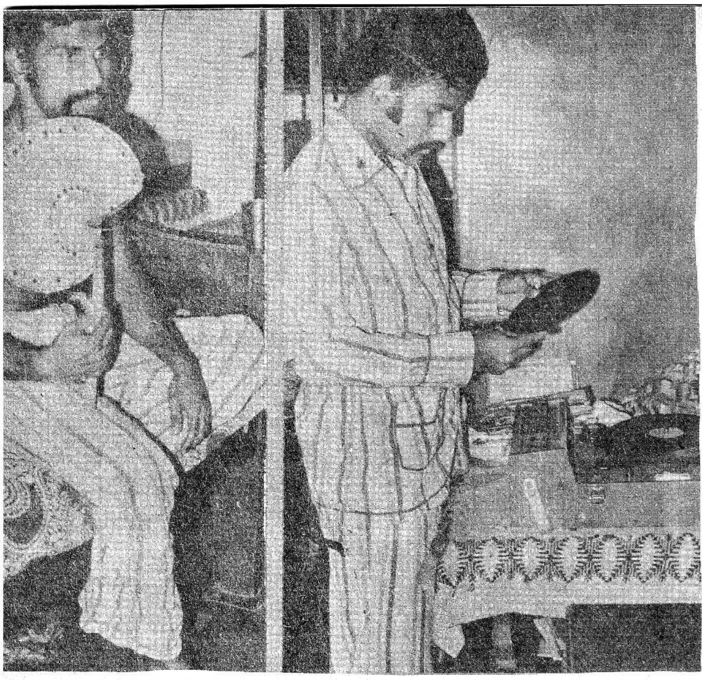
মাঠগুলি তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সম্পর্কে দায়িত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তি এন আই এস অথবা জি ডি আর থেকে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হলেই 'এক্সপার্ট' হয়ে যাবে এমন কেউ দাবি করতে পারেন কি? বিভিন্ন খেলাধুলোর জন্য জীবনপাত করেছে এমন লোকের অভাব এদেশে নেই। অথচ বিভিন্ন কমিটির সদস্য নেবার ব্যাপারে এর ভাই ওর শ্যালক ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আসলে কমিটি সদস্যদের এধরনের এক একজনকে ধরে একজন যদি মতামত দিতে থাকে তবে তা শেষ হতেই ১৯৮২ এসে যাবে।

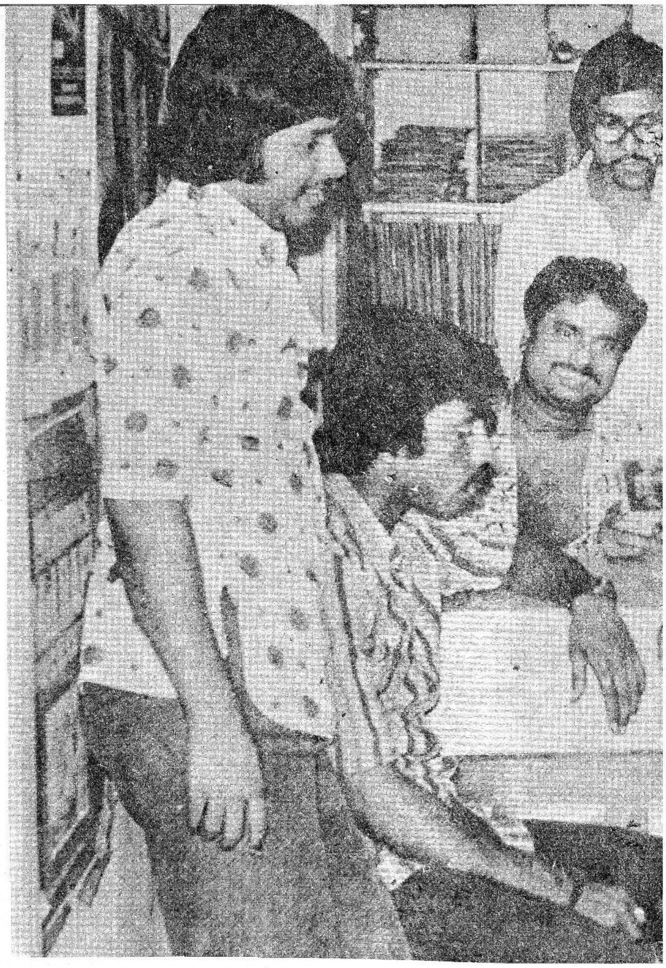
কলকাতায় কি কি সুযোগ আছে সে সম্পর্কে 'খেলার আসরে' ইতি-পূর্বে বিশদ লেখা হয়েছে। তাই সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকে সে কথা লিখে পাঠককে বিরক্ত করতে চাই না। তবে শেষ কথা, দিল্লির দর্শক মোটেই খেলাধুলোয় সচেতন নয়, যেমন কলকাতা। কলকাতার পরই এক্ষেত্রে স্থান পাবে বোম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য কয়েকটি শহর।

ছড়া

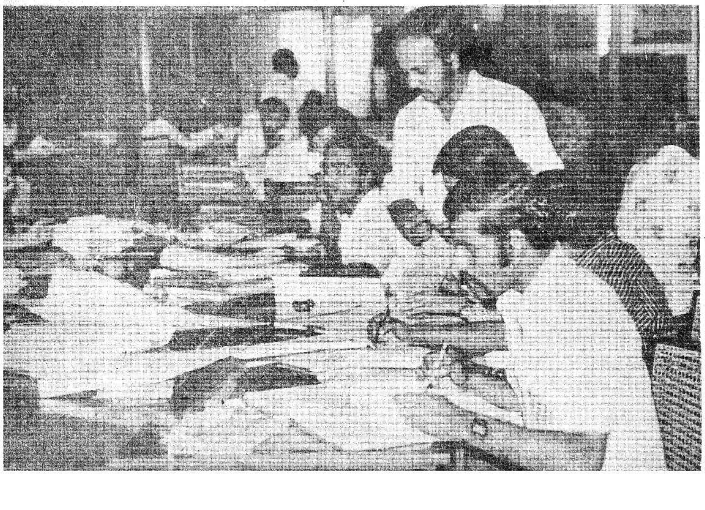
প্রবীর সরকার

এই কারণে খেলার মাঠে যাইনা,
লাইন দিয়েও হকের টিকিট পাইনা।
তাইতো কেউ ভালো খেলুক চাইনা,
নিজের দলের গুণগান আর গাইনা।
গোল খেয়েও আজ তাইতো গোল খাইনা
এইতো আছি ভালো আছি—তাইরে—
নাইরে—নাইনা।





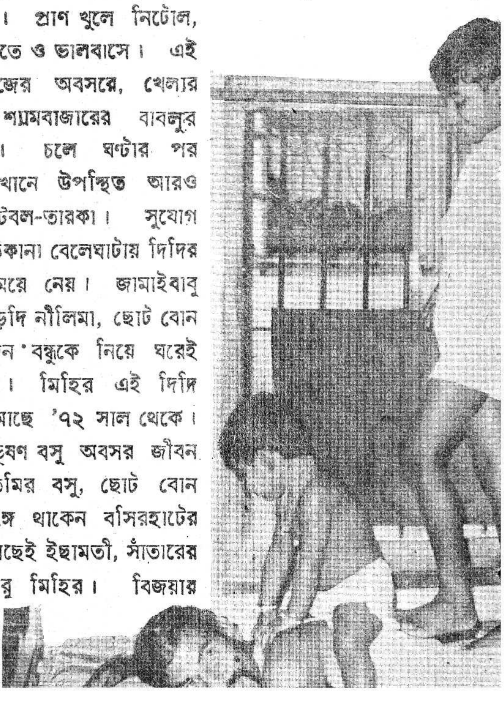


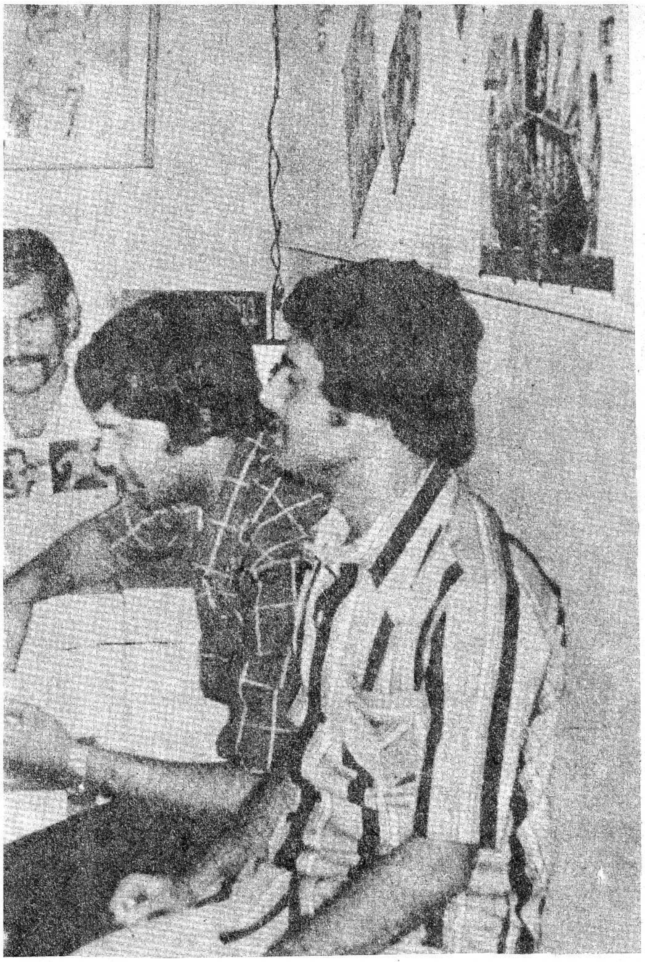


আড্ডাপ্রিয়

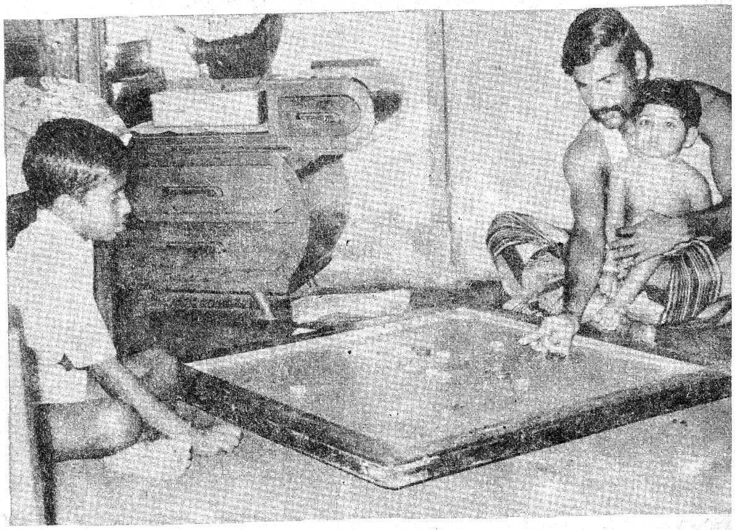
ছবি ঃ পাহা

মাঠের বাইরে মিহির বসু ফুটবল নিয়ে ভাবতে নারাজ। সে যে ফুটবল পরিবেশের ফুটবলায় তাকে যেন নিজের মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে নিতে পারেনি। কারণ মিহির নাগাড়ে কথা বলতে ভাল না বাসলেও আড্ডাপ্রিয়। প্রাণ খুলে নিটোল, নিষ্কলঙ্ক আড্ডা দিতে ও ভালবাসে। এই আড্ডার টানেই কাজের অবসরে, খেলার ফাঁকে ও চলে যায় শ্যামবাজারের বাবলুর রেকর্ডের দোকানে। চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা। ওখানে উপস্থিত আরও বেশ কয়েকজন ফুটবল-তারকা। সুযোগ পেলে ওর বর্তমান ঠিকানা বেলেঘাটায় দিদির বাড়িতেই আড্ডা জমিয়ে নেয়। জামাইবাবু মনতোষ পালিত, বড়দি নীলিমা, ছোট বোন আরতি ও দু'চারজন বন্ধুকে নিয়ে ঘরেই জমিয়ে আড্ডা দেয়। মিহির এই দিদি জামাইবাবুর কাছে আছে '৭২ সাল থেকে। বাড়িতে বাবা ফণীভূষণ বসু অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। বড়দা তিমির বসু, ছোট বোন আরতি সব একসঙ্গে থাকেন বসিরহাটের কাছারিপাড়াতে। কাছেই ইছামতী, সাঁতারের নেশা মেটায় সাঁতারু মিহির। বিজয়ার





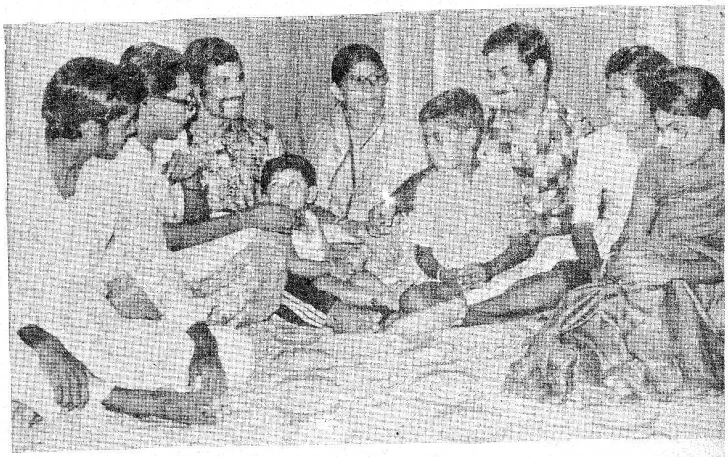


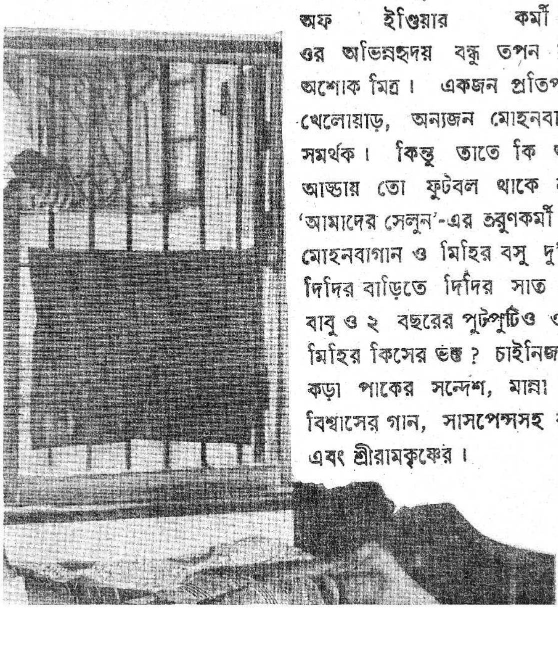


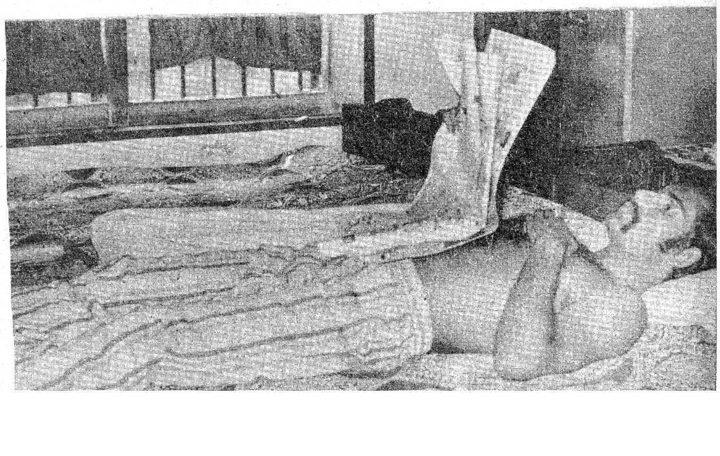
মিহির বসু

রায়চৌধুরী

সময় 'ভাসানে'র দিন প্রতিবছরই ও বাড়িতে যায়, গ্রামের বন্ধুরা ওকে ছেঁকে ধরে, ও সেখানেও আড্ডা বসায়। পুরনো বন্ধুদের ক্লাব ইয়ং স্টার ওর বড় প্রিয়। সবার প্রিয় —যেমন বাড়িতে, তেমনি কলকাতায়। ১৯৫৫ সালের মে মাসে ওই বসিরহাটে ওর জন্ম, ওখানেই পড়াশুনো। বর্তমানে মিহির ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কর্মী। কলকাতায় ওর অভিন্নহৃদয় বন্ধু তপন দাস, পাড়ায় অশোক মিত্র। একজন প্রতিপক্ষ শিবিরের খেলোয়াড়, অন্যজন মোহনবাগানের বাঘ সমর্থক। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আড্ডায় তো ফুটবল থাকে না। পাড়ার 'আমাদের সেলুন'-এর তরুণকর্মী সমীর মল্লিক মোহনবাগান ও মিহির বসু দু'জনেরই ভক্ত। দিদির বাড়িতে দিদির সাত বছরের ছেলে বাবু ও ২ বছরের পুটপুটিও ওর বড় ভক্ত। মিহির কিসের ভক্ত? চাইনিজ ফুড, জলভরা কড়া পাকের সন্দেশ, মান্না দে ও দেবব্রত বিশ্বাসের গান, সাসপেন্সসহ বই বা পত্রিকা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের।







জুনিয়র জাতীয় হকিতে আই এ ও পাঞ্জাব যুগ্মবিজয়ী

কটক থেকে বরেন্দ্র কৃষ্ণ ঢাল ঃ কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় জুনিয়র হকি চ্যাম্পিয়নশিপে যুগ্মবিজয়ী হল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আর পাঞ্জাব। ফাইনালের লড়াইটা জমেছিল ভালো, অতিরিক্ত সময়ের কুড়ি মিনিটের আগে কোন পক্ষেই একটিও গোল হয়নি।

তুলনামূলকভাবে বিমানবাহিনীই বেশী ভালো খেলেছে। বেশীর ভাগ সময়ই বল ছিল তাদের আয়ত্তে। ভালো খেলেও তারা গোল পায়নি তার প্রধান কারণ তাদের দুর্বল মার্কস্‌ম্যানশিপ। ন'টি পেনাল্টি কর্নার আর তিনটি কর্নার পেয়েও সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারেনি বিমানবাহিনীর খেলোয়াড়রা।

অপরদিকে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়েরা প্রায় সারাক্ষণই ঘর সামলাতে ব্যস্ত ছিল, তবু দু'একবার বেশ দাপটের সঙ্গে তেড়েফুঁড়ে উঠে এসেছিল প্রতিপক্ষের সীমানায়, গোল করার দুটো সুবর্ণ সুযোগ তারা কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথমার্ধে বিমানবাহিনীর ইনসাইড রাইট মরভিন একটি পেনাল্টি কর্নার সট ঠিকমত কনভার্ট করতে পারলে দলকে এগিয়ে দিতে পারত। তার দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড জালালুদ্দিন ও ওয়াসিম ও পাঞ্জাব দলের অমুক সিং-এর খেলা সকলের নজর কেড়েছে।

পাঞ্জাবের সুরিন্দর সিং সোঙ্কি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে, এই ম্যাচে তাকে তার খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে দেখা যায়নি, বিমান বাহিনীর রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা সারাক্ষণ তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। দু'দলেরই দুটি গোলমুখী সট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।

খেলা শুরু হয়েছিল ১৭ জুন, যোগ দিয়েছিল মোট ২৩টি দল। মোট গ্রুপ করা হয়েছিল ৮টি, প্রতি গ্রুপ থেকে একটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল গতবারের বিজয়ী সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়, গতবারের রানার্স ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, পাঞ্জাব, ভূপাল, দিল্লি, মণিপুর, বোম্বে ও সার্ভিসেস। কোয়ার্টার ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর সেমিফাইনালে উঠেছিল দুই ফাইনালিস্ট দল ছাড়া ভূপাল আর বোম্বে।

সেমিফাইনালে ভূপাল আর পাঞ্জাবের খেলায় লাঠালাঠি বেশী হয়েছিল, পাঞ্জাব সে খেলায় খানিকটা ভাগ্যের জোরেই ২-০ গোলে জেতে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আর বোম্বের সেমিফাইনালের খেলায় কোন জৌলুস ছিল না। বিমানবাহিনী জিতেছে ৩-০ গোলে অনায়াসে।

কটকে এসেও খেলতে পায়নি মহারাষ্ট্র দল। তারা তিন দিন অপেক্ষা করেছিল খেলার আশায়, কিন্তু পুনে কোর্টের এক ইনজাংশনের ফলে আয়োজক ওড়িশা হকি অ্যাসোসিয়েশন তাদের খেলার অনুমতি দিতে পারেনি।

এই টুর্নামেণ্টের প্রধান আকর্ষণ ছিল, এখান থেকেই আগামী মস্কো ওলিম্পিকের জন্য ভারতের জুনিয়র হকি দলের খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয়েছে। এবছরের শেষের দিকে বাছাই করা ত্রিশজন খেলোয়াড় বাঙ্গালোরের কোচিং ক্যাম্পে যাবে। এই ত্রিশজনের মধ্যে পাঞ্জাবের লেফট আউট রাজীন্দর পালের নাম নেই, যদিও সে গত এশিয়ান গেমসে ভারতীয় হকি দলে ছিল।

প্রাথমিক রাউণ্ডে উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে।

এমন কেমন খেলা

ক'দিন আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ধারে দাঁড়িয়ে বক্সিং দেখছিলাম। দেখলাম ঘুঁষি লেগে কয়েকজনের মুখ কেটে গেল। এক-জনের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ইস বক্সিং খেলাটা কী খারাপ শুনেছি এতে নাকি কেউ কেউ মরেও গেছে বিদেশে। আচ্ছা তাহলে ওই খেলা কেন।

পুরনো একটি কি ম্যাগাজিনে পড়লাম, কয়েক বছর আগে কলকাতায় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় শংকর ব্যানার্জির পা ভেঙে গেছিল। আবার কে নাকি রেফারিকে ঘুঁষি মেরেছিলেন। খেলাধুলা খুব ভাল জিনিষ—তাই তো স্যারও বলেন স্কুলে। আমরা সবাই তাই বইয়ের চাইতে খেলা হলে আরও হই চই করি। আচ্ছা এই সব ব্যাপার ঘটলে তো বাপী আমাকে খেলতে দেবে না। বলবে—খবরদার, খেলাধুলো একদম নয়। আমি বলছি—তাহলে আমার পড়াশুনো একদম হবে না। আমার বন্ধু সূরজও বলেছে—যেদিন ওর মা খেলতে যেতে দেবে না—সেদিন ও বই-টই খুলবে না।

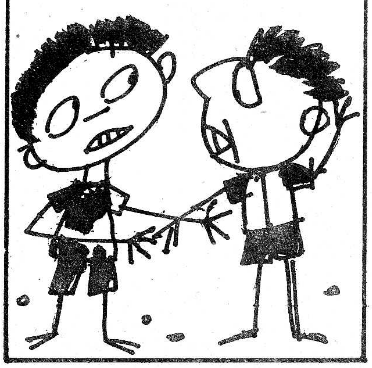
আমি তাই বলছি—খেলার মাঠে মারপিট একদম নয়। রক্ত দেখলে ভয় হয়। বলুন ত এখন কি করি?

অতনু মজুমদার (১৩)
নিউ আলিপুর

গড় দেখিনি

গড়ের মাঠে গড় দেখিনি
দেখছি শুধু খেলা
খেলার আগে ভালো মানুষ
খারাপ শেষের বেলা

পেলে সান্যাল (১৩)



উঠছে যারা

নতুন বিভাগ, ১৪ বছরের কম বয়সীরাই এই বিভাগে লিখবে, আঁকবে। তবে ঠিক হয়েছে —— অংশগ্রহণকারী সকলকে বিদ্যালয়ের প্রধানকে দিয়ে আঁকা ও লেখার সঙ্গে বয়সের সার্টিফিকেট পাঠাতে হবে।

—সম্পাদক

কী সুন্দর স্টেডিয়াম!

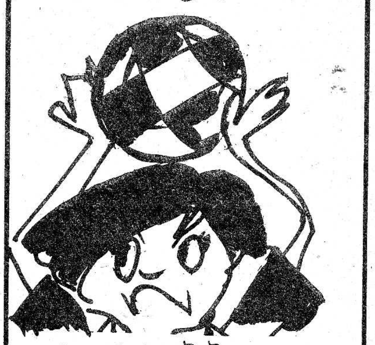


জানি তোমরা অনেকে আমাকে বোকা বলবে। কিন্তু আমি মনে প্রাণে বলছি—কলকাতায় গিয়ে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে একটা অন্য জিনিষ। আমি বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞেস করি—যারা কলকাতায় ঘুরে এসেছে তাদের। তোমার কি ভালো লেগেছে। কেউ বলে চিড়িয়াখানার শাদা বাঘ। কেউ বলে চিড়িয়াখানায় ঢোকার মুখে বিজলিগ্রিল রেস্টুরেন্টের কাছের ময়নার কথা বলা। কেউ বলে বিড়লা তারামণ্ডল, কেউ বলে রাতের গঙ্গা, কেউ বলে যাদুঘর। কেউ বলে রবীন্দ্র সরোবরে বিকালে নৌকা বাইচ। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ ইত্যাদিও অনেকের ভালো লাগে। আমার এসব ভালো লাগে না তা নয়। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমি অবাক হয়ে বসেছিলাম গত জানুয়ারিতে নেতাজী স্টেডিয়ামে। তখন ওখানে সারা-ভারতের মেয়েদের খেলাধূলা হচ্ছিল। মা বলল; মা বিদেশের অনেক জায়গায় ঘুরেছে বাবার সঙ্গে, কিন্তু কলকাতায় এই স্টেডিয়াম নাকি তাকিয়ে দেখার মতন।

আমার রাঙাদা কলেজে পড়ে, সেও বলল এমন সুন্দর স্টেডিয়াম নাকি সারা ভারতে নেই। জানুয়ারিতে দেখলাম খেলার সময় কি সুন্দর আলো, মাইকে টুং টাং আওয়াজ, তারপর ঘোষণা। আর মেঝেতে খেলা হচ্ছে বাস্কেটবল, টেবল টেনিস ইত্যাদি। রং বেরং-এর জামা কাপড় পরে এসেছেন কত মানুষ। সব মিলিয়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল। বড় হয়ে আমি লেখিকা হলে আরও সুন্দর করে সব্বাইকে জানাবো। এত ভাল লেগেছিল স্টেডিয়ামটা—আমি গতবার কলকাতায় গিয়ে আর কিছুই দেখিনি। পরপর তিনদিন স্টেডিয়ামে কাটিয়েছি।

নমিতা বসু (১৩)
শিলং

শুধুই ফুটবল



মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল
দুটো বড় দল
একটা মায়ের একটা বাপির
আমার শুধু 'ফুটবল'।

অভিজিৎ সাহা (১২)

সাঁইথিয়ায় ফুটবল

গত ২০ জুন সাঁইথিয়ায় ফুটবল লিগ খেলা শুরু হয়েছে। অংশগ্রহণ করেছে সাঁইথিয়ার হোমিওপ্যাথি কলেজ ও অভেদানন্দ কলেজ, ভ্রাতৃ সংঘ ও হাইস্কুল, রামপুর হাট ও আহমদপুর এছাড়া আরও অনেক দল আছে। পরিচালনা করছে ভ্রাতৃ সংঘ। প্রথম খেলা ২০ জুন ভ্রাতৃ সংঘ বনাম হাই স্কুলের মধ্যে ছিল। খেলা গোলশূন্য ড্র হয়ে গিয়েছে। তবে এই খেলাটা নিশ্চয়ই কলকাতার গড়ের মাঠের গড়াপেটা নয়।

ভন চ্যাটার্জি (১৪)
সাঁইথিয়া, বীরভূম



দুই দলের খেলোয়াড় ও স্থানীয় কর্মকর্তারা

উত্তরবঙ্গে প্রথম মেয়েদের হকি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উত্তরবঙ্গ বোধহয় এই প্রথম মেয়েদের হকি দেখল। শুধু দেখল না, বুঝল মেয়েদের আর ললনা আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। আর প্রেরণা পেল অনেকে—'শুধু কলকাতা কেন এই উত্তরবঙ্গের আমরাও চেষ্টা করতে পারি।'

কলকাতা থেকে জনা পঁচিশেক মেয়ে এসেছিল উত্তরবঙ্গে। বলাবাহুল্য ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব ও শিলিগুড়ির দাদা-ভাই স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগেই ওরা ৯ ও ১০ জুন দুদিনের জন্য আসেন। দুটিই প্রদর্শনী ম্যাচ। তাও আবার কলকাতা বনাম কলকাতা। সুষমা ক্লাব এবং কলকাতা বাছাই একাদশ। ৯ তারিখে নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছেই ওরা বাসে চলে আসেন ময়নাগুড়ি। মেয়েদের কেউ কেউ চাকুরে। ম্যানেজার শুক্লা মজুমদারের কাছে শুনলাম—অধিকাংশই ছাত্রী। আবার কারুর কারুর অরিজিনাল খেলা হকি নয়। যেমন রাজশ্রী ভট্টাচার্য। তিনি নামী অ্যাথলিট। দুই দলে খেলোয়াড় ছিলেন ১১ + ১১ = ২২ জন। এসেছিলেন কয়েকজন কর্মকর্তাও। রণধীর ব্যানার্জি, দিলীপ মাঝি, তপন দাস ও সুজিত বসুরা থাকায় খেলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে স্থানীয়দের তেমন মাথা ঘামাতে হয়নি। কলকাতা থেকে পুরো একটা রাত্রি ট্রেনের ধকল, তারপর নিউজলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত এতটা বাস জার্নি তবুও বিকালে খেলা স্থানীয় সকলকে উৎসাহিত করে। বিকালে টাউন ক্লাব ময়দানে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে কয়েক হাজার দর্শক তারিফ করলেন ওদের।

খেলার আগে শিলিগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ও উত্তরবঙ্গের খেলাধুলা যাকে বাদ দিয়ে চিন্তাই করা যায় না—সেই এস পি রায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

ময়নাগুড়িতে খেলা বেশ জমে উভয় পক্ষ যখন গোল দিতে থাকে। সুষমা-র পক্ষে গোল করেন রীণা সরকার, সুরভি মিত্র ও কৃষ্ণা বসু। কলকাতা বাছাই দলের চন্দ্রা গাঙোত্রা একটি গোল শোধ করেন।

ওইদিনই খেলোয়াড়রা শিলিগুড়ি চলে যান। পরদিন ১০ তারিখে শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে নামল দুটি দল দারুণ উল্লাস ধ্বনির মধ্যে। দাদা—ভাই স্পোর্টিং-এর সম্পাদক অমিয় বসু জানালেন, ওখানে এই প্রথম হকি (পুরুষদের হকিও হয়নি ওখানে)।

তবে কলকাতার মেয়েদের খেলা যেমন উৎসাহভরে শিলিগুড়িবাসীরা দেখতে এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তেমন উৎসাহ ছিল না। খেলা হয়েছে অনেকটা ডিফেন্সিভ, তাই গোলও হয়নি।

দুই দলে খেলেছিলেন ঃ

সুষমা ক্লাব ঃ সুরভি মিত্র, সোমা শেঠ, বনানী শেঠ, রমা দাস, শিপ্রা মজুমদার, রীণা রায়চৌধুরী, রাজশ্রী ভট্টাচার্য, বীথিকা দাস, কৃষ্ণা বসু, কল্পনা কুণ্ডু, রীণা সরকার।

কলকাতা বাছাই ঃ চন্দ্রা গাঙোত্রা, পূর্ণিমা পাল, মায়া ভাগ্নানী, শালীনি সিদানা, জ্যাকিয়া ফিল, সুপ্তিশুভ্রা ব্যানার্জি, সোমা চোরিত, সারিনা কাণ্টরো, আশা গাঙোত্রা, স্বেতী নাথ, নীয়েল, রেবেকা শীল।

দিনহাটার আন্তঃজেলা কবাডি ওপার বাংলাকেও টেনেছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি কোচবিহার জেলা কবাডি সংস্থার উদ্যোগে ছোট মফঃস্বল শহর দিনহাটায় তৃতীয় বার্ষিক আন্তঃজেলা কবাডির আসর বসেছিল স্থানীয় চিলড্রেন্স পার্কে। ৯ থেকে তিনদিনের লিগ কাম নক আউট এই প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে হুগলী ও মেয়েদের বিভাগে নদীয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দার্জিলিংয়ের ছেলেমেয়েরা গোড়া থেকেই ভাল খেলে চমক দেখায়।

ছেলেদের বিভাগে যোগ্য দল হিসেবেই হুগলী জয় পেয়েছে। অথচ সেমিফাইনালে ২৪ পরগণার বিরুদ্ধে চন্দননগরের ছেলেদের আক্রমণাত্মক খেলা দেখে (২৯—৭) অনেকেই ভেবেছিলেন ওরাই চ্যাম্পিয়নশিপ পাবে। অন্যদিকে নদীয়াকে ১৪—১ পয়েন্টে হারিয়ে হুগলী ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু ফাইনালে হুগলীর চোস্ত আক্রমণ ও রক্ষণের বিরুদ্ধে চন্দননগর মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠা ছাড়া বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। হাওড়া, বর্ধমান, হুগলী, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, ২৪ পরগণা, চন্দননগর ও নদীয়া এই দশটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে প্রাথমিক পর্যায়ে খেলাগুলি সকালে ও বিকেলে চালানো হয়েছিল।

প্রথমে যোগদানের সম্মতি জানিয়েও দার্জিলিং, কোচবিহার, নদীয়া ও চন্দননগর ছাড়া আর কেউ মেয়েদের দল পাঠাতে পারেনি টাকার অভাবে। অবশ্য রেল কর্মীরা বোনাসের দাবিতে গো-শ্লো পন্থা অবলম্বন করার ফলে ট্রেন সংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন অনেকে দল পাঠাতে পারেনি টাকা যোগাড় সত্ত্বেও। ফলে চারটি দল নিয়ে মেয়ে বিভাগে খেলা তেমন জমে উঠতে পারেনি।

এরমধ্যে দার্জিলিংয়ের মেয়েরা কিছুটা বেগ দিলেও নদীয়া বা চন্দননগরের মেয়েদের ফাইনালে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ফাইনালে সামগ্রিক বিচারে নদীয়া প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে চন্দননগরকে ৪—১ হারিয়ে দেয়। ফাইনালের দিন মাঠ উপচে পড়া

হাজার পাঁচেক দর্শকের কিছু অংশ উত্তেজনার বশে কোর্টে ঢুকে পড়ায় দুবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়। দর্শকদের উৎসাহের সঙ্গে আম্পায়াররা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করায় প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই দারুণ জমাটি লড়াই হয়েছে। অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দিনহাটার মত ছোট জায়গায় এই প্রতিযোগিতা করার পিছনে রাজ্য সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কবাডির প্রসার বাড়ানো। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে একমাত্র মালদা ছাড়া প্রত্যেকেই যোগ দিয়েছিল। অবশ্য মালদা জেলা কবাডি সংস্থা না আসার কোন কারণ দর্শাতে পারেনি। তাছাড়া আর্থিক সংকটের দরুন শেষ পর্যন্ত সবগুলি দল হাজির হতে না পারায় প্রতিযোগিতা পরিপূর্ণ রূপ পায়নি। কবাডি খেলা দেখে মুগ্ধ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান লিখিতভাবে বহুদিনের অব্যবহারের প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া চিলড্রেন্স পার্কটি দিনহাটা সাব-ডিভিসনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক পুনু বসুর হাতে তুলে দিয়েছেন। এটাই এবারে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় সাফল্য। উদ্যোক্তা কোচবিহার জেলা কবাডি সংস্থার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থায় খুশী সকলেই। গোটা প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের থাকা, খাওয়া ও আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছু মিলিয়ে আনুমানিক খরচ ১২ হাজার টাকা। এরমধ্যে সাত হাজার টাকা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে। বাকি টাকা তোলা হয়েছে জনসাধারণের দান থেকে। উল্লেখ্য কবাডি খেলার টানে দিনহাটার কাছাকাছি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ওপার বাংলার প্রচুর দর্শক নিয়মিত খেলা দেখতে এলেও জেলার কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে এক মিনিটের জন্যেও মাঠে দেখা যায়নি।



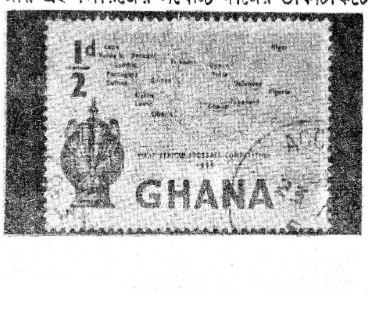
কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলা মহিলা কবাডি দলের খেলায় দার্জিলিং জেলা দলের মেয়েরা 'রেড' করছে

ডাকটিকিটে খেলাধূলা



তপন রায়ঃ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই নিজ নিজ এলাকা বিশেষে বিভিন্ন ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। আর সবার ওপরে বিশ্বকাপ বা ওলিম্পিক ফুটবল তো রয়েছেই। ফুটবলকে বিশ্ব জনপ্রিয়তার বেদীমূলে প্রতিষ্ঠা করতে বিভিন্ন দেশের ডাকবিভাগের দান বিন্দুমাত্র কম নয়। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত কত ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে তা বলা শক্ত। বিশ্বকাপ বা ওলিম্পিক ফুটবলকে স্মরণীয় করতে যেমন প্রচুর ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয় তেমনি বিভিন্ন দেশের ছোট বড় বিভিন্ন প্রতিযোগিতাকে বিষয়বস্তু করেও হরেকরকম ডাকটিকিট প্রকাশ পাচ্ছে। এই ধরনেরই এক প্রতিযোগিতাকে জনমানসের গোচরে আনতে সাহায্য করেছে ছবিতে প্রকাশিত ডাকটিকিটগুলি।

ঘানা ১৯৫৯ সালে 'ওয়েস্ট আফ্রিকান ফুটবল কম্পিটিশন ১৯৫৯' উপলক্ষে পাঁচটি সুন্দর ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। সবচেয়ে কম দামের ডাকটিকিটে (১/২ ডি) পশ্চিম আফ্রিকার যে ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল তাদের নাম ও মানচিত্রে তাদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। দেশগুলি হল কেপ ভারডে আইল্যাণ্ড, সেনেগল, গাম্বিয়া, পর্তুগীজ গুয়ানা, সিয়েরা লিওন, গুয়ানা, সুদান, লাইবেরিয়া, নাইজার, ডাহোমি, টগোল্যাণ্ড, নাইজিরিয়া, আপার ভল্টা ও ঘানা। তারপরের ডাকটিকিটে (১ ডি) দু'জন ফুটবল খেলোয়াড়কে দেখানো হয়েছে। ৩ ডি দামের ডাকটিকিটে গোলকিপারকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল বাঁচাতে দেখা যায় ও সেই সঙ্গে দেখা যায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলির পতাকাগুলি সারিবদ্ধ অবস্থায় উড্ডীয়মান। কিভাবে গোলকিপার বিপক্ষ খেলোয়াড়ের পা থেকে বল তুলে নিচ্ছে তা প্রতীয়মান হয় ৮ ডি দামের ডাকটিকিটে। আর এই সিরিজের সর্বোচ্চ দামের ডাকটিকিটে (২ স ৬ ডি) এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে যে কাপ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল সেই বিখ্যাত 'গোল্ড কাপটি' মূর্ত করা হয়েছে। ডাকটিকিটগুলি বর্ণে, বৈচিত্র্যে ও আঙ্গিকে ফুটবল খেলার ডাকটিকিটগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আসছে।





এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পাঁচটি ডাকটিকিটে ঘানার প্রথম খেলাধূলা বিষয়ক ডাকটিকিট। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে ঘানা ফুটবলে যে বেশ উন্নত তার প্রমাণ এই ডাকটিকিটগুলি। কারণ ১৯৫৯ সালের 'ওয়েস্ট আফ্রিকান ফুটবল কম্পিটিশন উপলক্ষে ১৪টি অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে ফুটবল-পাগল ঘানা ছাড়া আর কোন দেশ কোন ডাকটিকিটই প্রকাশ করেনি।

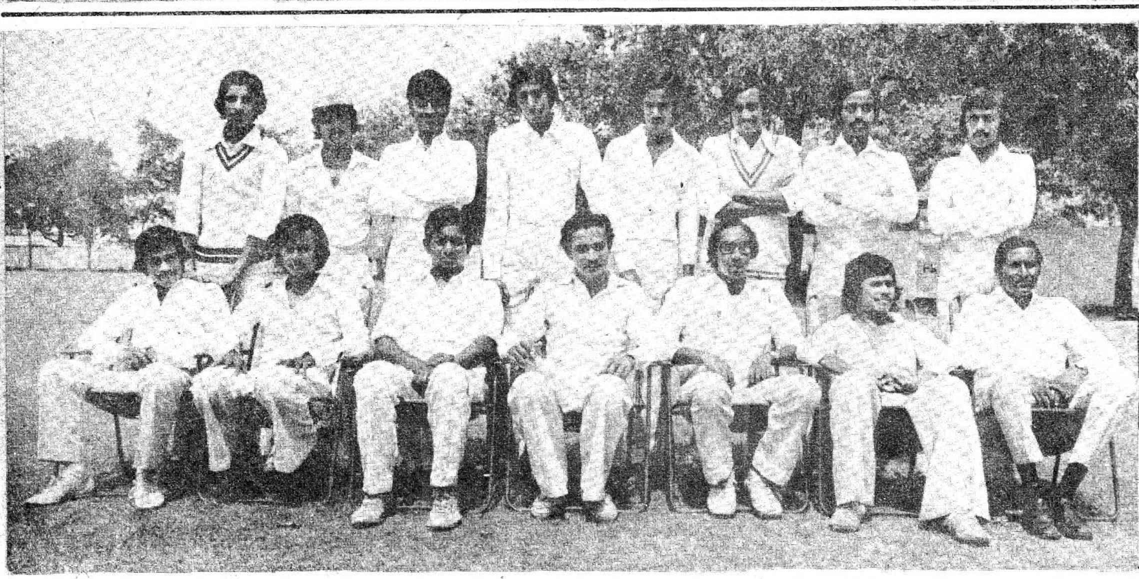


আন্তঃজেলা ভলিবলে মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হাওড়া জেলা দল



অফিস স্পোর্টস ফেডারেশন আয়োজিত আন্তঃঅফিস লিগ ক্রিকেট ও নক্ আউট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া স্পোর্টস ক্লাব।

সংবাদ চিত্র



দ্বিতীয় ডিভিসন ক্রিকেট লিগ ও জুনিয়র নক্ আউট

চ্যাম্পিয়ন শ্যামবাজার ক্লাব

‘শুধু ইস্ট-মোহন / আর মোহন-ইস্ট’

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মে থেকে সেপ্টেম্বর— কটা মাস সমগ্র কলকাতাকে আলোড়িত করে, মাতায় এবং উত্তেজনার আঁচে জীবন্ত করে রাখে মাত্র একটি শব্দের প্রতাপ ও তেজ। শব্দটি ‘ফুটবল’। একজন এই দল, আর একজন অন্য দল—তাহোক, তবু ওদের সকলের কাছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু একটাই ফুটবল। মোহন-ইস্টের পারস্পরিক মিলনের দিন বাংলার তাপাঙ্ক কত ডিগ্রি ফারেনহাইটে ওঠে, আলিপুর আবহাওয়া অফিসের রাডার যন্ত্রও তার সঠিক হিসাব দিতে পারে না। যত বড় ঘটনাই ঘটুক, তার প্রতিক্রিয়াও এই পাহাড়-প্রমাণ উত্তেজনাকে শীতল করতে অক্ষম। বিশ্বকাপ-ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার কাছে হারের লজ্জাও কলকাতাকে উন্মাদনা থেকে ছিটকে দিতে পারেনি। গলি থেকে রাজপথ, রাজপথ থেকে রাজভবন, বাস-ট্রাম-ট্রেন-মিনি-ডিল্যাক্স-এল-ডাবল ডেকার কোথায় নয়!

—‘এই উঠেছিস?’

—‘উঠেছি।’

—‘এই পটলা, গোপলা উঠেছে তো!’

—‘উঠেছে, কিন্তু গেটে ঝুলছে।’ —ওরা সবাই মাঠে যাচ্ছে, এমনি করে প্রতিদিন যায়। সময়টা এখন এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। এই টাইমেই সাধারণত ওরা বেরিয়ে পড়ে। অধিকাংশই গিয়ে দাঁড়ায় ষাট পয়সায়, কিছু এক টাকা দশে। মাঠের লাইনে যেভাবে জনস্রোত উপচে পড়ছে, তাতে এরপরে গেলে টিকিট পাওয়া দুষ্কর—এটা ওরা ভালো করেই জানে। ওদের গন্তব্যস্থল দুটো মাঠ, যেদিন যার টিমের খেলা। বাসে আমি দুদিন দুটি দৃশ্য দেখেছি। একদিন একটি বছর দশেকের ছেলেকে সবুজ-মেরুন গেঞ্জি পরে মাঠের দিকে যেতে এবং আর একদিন চোদ্দ বছরের একটি ছেলেকে লাল-হলুদ জামা গায়ে বাসে উঠতে। অফিস যাত্রীদের ভিড় থিতিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পর থেকেই এই কটা মাস যানবাহনগুলো অধিকাংশ ‘ইস্ট-মোহন’ সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে। এবং এই চলার ফাঁকে নানা ডায়ালগ, মন্তব্য ও আলোচনায় সরগরম থাকে বাস-ট্রাম-ডাবল ডেকারের ভিতরটা।

—‘তুই-ই ক, পিন্টুরে কি ছাড়া উচিত ছিল?’ —এক যুবক তার বন্ধুর কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করল। বন্ধু জবাব দিল—‘যাই বলো ভাই, দিন এগোবার সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ যথেষ্ট ভালো খেলছে।’

অন্যদিকে তখন কনফারেন্স শুরু হয়ে গেছে—‘মাইরি, হরজিন্দার কি নামবে না?’

—‘ও নাকি ইনে খেলতে চাইছে! বছর পনেরোর একটি ছেলে খুব দ্রুত বিজ্ঞের মত খবর জানিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের গলা শোনা গেল—সাবির এবার স্ট্রাইকারে যা খেলছে না! দেখছ না, ওর হেডেই কতবার কেল্লা ফতে হচ্ছে।’

—‘সবই তো বুঝলাম চাঁদ, আগে আসল গুরুর (সুরজিত) কথা বল। সুরোদার উপরই তো সব নির্ভর করছে।’

—‘ডিফেন্সে মনা’র কথাও বল বে। মনা আমাদের রক্ষণের টাওয়ার।’

—‘গুরুদেব কিন্তু বেশ সেট কইর‌্যা গেছে। অর ওই লম্বা, উঁচু সটগুলো থেইকা, যাই কও, সুরজিৎ কিন্তু যে কোন সময় ডেঞ্জার ক্রিয়েট করতে পারে।’

আর এক আলোচনা, দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে—‘কি টেনশন দেখেছেন।’

—‘আর কইয়েন না, বাহান্ন ছাড়ামু আগামী মাসে—এই রকমটা আর দেখি নাই।’

—‘আমাদের অফিসে এক যুবক কাজ করে, তিন বছর যাবত ফার্স্ট ডিভিসনে খেলছে, একটা ম্যানেজ করে দেবে বলেছে। আর বলবেন না মশাই, বড় পুত্রটি একেবারে কান ঝালাপালা করে দিলো।’

—‘আমার বাড়িতেও তো একই অবস্থা মশাই। আর কইয়েন না। আমারেও ধান্দায় থাকতে হইত্যাছে পোলার তুষ্টি সাধনের জন্য। দেখি, যদি একটা মিল্যা যায়।’

আর একদিনের কথোপকথন ঃ—‘মাইরি, পায়াস কিরকম শেকি হয়ে গেছে।’

—‘না জেনে কেন মেলা ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস্ ভোম্বল—পায়াস ইনজিওরড, ইনজেকশন নিয়ে খেলছে।’

—‘যাই বলো, গৌতমদার উপরই টিমটা দাঁড়িয়ে আছে।’

—‘কেন, বিদেশ-মানসার স্পিড!’

—‘বুঝলাম, কথাটা সত্যি—কিন্তু সাপ্লাই লাইনের ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছিস কেন পণ্ডু।’

—‘এই, এবার কিন্তু জেঠু (প্রদীপ চৌধুরী) দারুণ খেলছে রে। এমনকি বড় ভরসা কাকুকেও (সুরত ভট্টাচার্য) মাঝে মাঝে বিট করে দিচ্ছে।’

হঠাৎ ওদেরই মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট ছেলেটি বলল—‘আচ্ছা, ভজাদা—দিলীপ পালিত রেগুলার খেলছে না কেন?’

ট্রামের সর্বাঙ্গে লোক। জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ওরা চলেছে, আর হুইস্ হুইস্ শব্দ ছড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ছে হর্ষোৎফুল্ল চিৎকার। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। দু'প্রধানের এক দলের খেলা ভেঙেছে এবং জিতেছে। ওরা ট্রামের জানালায় বসে পড়েছে, গেটে ঝুলছে। কয়েকজন পথচারী বিস্মিত ও ভীতিপ্রদ দৃষ্টি মেলে পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে এবং চোখ কুঁচকোয়। শুধু কি ট্রামের গায়ে? না-বাসে: এমনকি বাসের ছাদেও বিউগল বাজে, কাঁসর ঘণ্টা আওয়াজ তোলে, ক্ষুদ্র থেকে বিরাট নানা ধরনের পতাকা পত্ পত্ করে, টুইস্ট হয়। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না। আর সবুজ-মেরুন—লাল-হলুদ যুদ্ধের আগের কটি দিন সমগ্র কলকাতা টগবগ করে কাঁপে। সর্বত্র শুধু একটাই টপিকস—ইস্ট-মোহন আর মোহন-ইস্ট। সবার মুখে শুধু একটাই প্রশ্ন—রেজাল্ট কি হবে?

মহারণের ঠিক আগের দিন এক দাদুর উৎকণ্ঠাপূর্ণ গলা শুনেছি বাসে—‘কাইল টিম অনুযায়ী জেতা উচিত আমাগোই। একটা কথা কই শোন—সুরজিত দাঁড়াইলে অরা ইস্ট-বেঙ্গলেরে ঠ্যাকাইতে পারবো না।’

বাগুইআটির বাজারে যিনি আমাকে একদা পান, পাতিলেবু এবং কাচা লঙ্কা সরবরাহ করতেন, তার বক্তব্য—‘টিমটা মোটামুটি সেট্ কইর‌্যা গেছে। দেবরাজটা ভাল খেলতাছে, সাবির ফর্মে, মিহিরও গোল পাইছে, সুভাষও খেলব, সুরজিত তো আছেই। তবু এই ম্যাচের ফল কি আগাম কওন যায়!’

যিনি আমাকে প্রত্যহ এলাচ ও উইলস ফ্লেক যোগান দেন, বাসের মাঝখানের রডটি ধরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন—‘হ্যাঁ, গৌতমের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে। আর বিদেশ—মানস যদি টেনশনটা কাটিয়ে উঠে নিজের খেলা খেলতে পারে, তবে লড়াইটা অবশ্যই হাড্ডাহাড্ডি হবে। চান্স?—ফিফটি-ফিফটি।’

বরিশাল কলোনীর রাম চ্যাটার্জির মত এমন পাঁড় মোহনবাগান-লাভার দুটো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় মোহনবাগান কংক্রিট-গ্যালারিতে কাটানো ওর এখন প্রাত্যহিক কাজ। রামঠাকুরের ভক্ত সে। ৭৬-এ ১৫ সেকেণ্ডের গোলে প্রিয় দল জেতার পর সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, জ্ঞান ফিরে এসেছিল দু'ঘণ্টা পর। এবার সে আশা-নিরাশার অস্থিরতায় ছটফট করেছে। একটা সার কথা বুঝতে ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি—সুরজিত ভয়ঙ্কর হলেই মুশকিল। বিপদ ঠেকানো কঠিন।

তারপর ৭ জুলাই এল। যেখানে যত বাঙালী আছেন, তারা কেউই এর বাইরে থাকতে পারেননি। সেদিন সন্ধ্যা মুখার্জি টিভি-র সামনে এসে বসেছেন—কর্তা শ্যামল গুপ্তও তাই, সন্তোষ দত্ত নিশ্চয়ই হাইকোর্ট থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসেছেন ওই একই উদ্দেশ্যে, মানবেন্দ্র মুখার্জি অবশ্যই গানের রেওয়াজ করেননি সেদিন, সোনালী গুপ্ত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে এসেছেন, শ্রাবন্তী মজুমদার লিভিং সাউণ্ডের কর্মব্যস্ততাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কান পেতেছেন রেডিওর সামনে, আরতি ভট্টাচার্য পাটনায় বসেও আশা-নিরাশায় দুলেছেন, শীর্ষেন্দু মুখার্জি হয়তো কিছুসময়ের জন্য কাগজ এবং কলম তুলে রেখেছেন, সুমিত্রা সেনের বাড়ি ছিল উন্মাদনায় ভরা, রেডিও-র শুক্লা ব্যানার্জি পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে বসে প্রিয় দলের জয় কামনা করেছেন, পার্থ এবং গৌরী ঘোষ নিশ্চয়ই দুজন দুজনকে দেখে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, শান্তিগোপালও কি ওইদিন মোহন-ইস্টের বাইরে নিজেকে মশগুল রাখতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই নয় এবং ভূপেন হাজারিকাও নিশ্চয়ই সুদূর ন্যুইয়র্ক থেকে কিছু সময়ের জন্য মনের পাখায় ভর করে উড়ে এসেছিলেন মোহনবাগান মাঠে। আর মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি, অভিনেতা শমিত ভঞ্জরা তো মাঠে হাজির হয়েছিলেন একেবারে সশরীরেই।

যাদবপুর, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাওড়া, দমদম প্রভৃতি অঞ্চলগুলো দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল সেদিন। এমন কি বাগুইআটির ‘বিচিত্রা’ এবং ‘ডোয়ারকিনও’ ভাগ হয়েছিল সেদিন দুটো ক্যাম্পে।

মে মাসে কলকাতা জ্বরাক্রান্ত হয়। তাপাঙ্ক হু হু করে বাড়তে থাকে, ৭ জুলাই তা চলে যায় আয়ত্তের বাইরে। অতঃপর লিগান্ত (লিগ + অন্ত) নামক ইনজেকশনের প্রয়োগে কিছুটা রেমিশন হয়। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় শিল্ড উপলক্ষ্যে তাপ আবার বাড়ে। তারপর কলকাতা তথা বাংলা মোটামুটি শান্ত হয়ে যায়।



এবার তুমিই ভরসা, ঘাড় থেকে নেমে গোল পাইয়ে দাও।

কার্টুন: পিজি



মেঘালয় হাউসে ছেলেরা/শংকর নাগ দাস

ভারত শ্রেষ্ঠ স্কুল ছাত্ররা মাদ্রিদ যেতে পারল না কেন ?

পবিত্র দাস ঃ এই মুহূর্তে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে প্রথম বিশ্ব স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছে। ওই আসরে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিল ভারতও। ঠিক হয়েছিল ভারত থেকে ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে শিলং-এর সেণ্ট অ্যাণ্টনি স্কুল। কারণ ওরাই এবার ভারত চ্যাম্পিয়ন স্কুল টিম, সুব্রত কাপ ওদেরই দখলে।

কিন্তু আমন্ত্রণ পেলেই যাওয়া যায় না। প্রস্তুতি চাই। স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার জর্জ সময় নষ্ট না করে সেই ব্যবস্থাই করতে লাগলেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বললেন। কথা বললেন কোচ প্রদীপ ব্যানার্জির সঙ্গে। ওর প্রশিক্ষণে ছেলেরা ছিল সুব্রত কাপ খেলার আগে। পি কের প্রতি ফাদারের অগাধ বিশ্বাস। পি কে রাজী হলেন। কিন্তু তখন কলকাতা ফুটবল লিগ মরশুমের শুরু। মোহনবাগান টিমকে মাজা ঘসা করছেন পি কে, কলকাতা ছাড়া চলবে না। অগত্যা ঠিক হোল পাহাড় থেকে ছেলেরা নেমে আসবে। কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করল মেঘালয় সরকার তাদের এখানকার 'মেঘালয় হাউসে।'

প্রচণ্ড গরম, লু বইছে। তারই মধ্যে ছেলেরা প্রতিদিন সকাল ৬টার আগে মোহনবাগান মাঠে হাজির হোত। পি কে একমনে তাদের ধারালো করে তুলতে লাগলেন। দু'তিন দিন মাঠে গিয়ে দেখেছি হাসিমুখে অনভ্যস্ত চড়া আবহাওয়ায় ওরা পরিশ্রম করে চলেছে। নটা নাগাদ ওরা মোহনবাগান তাঁবু থেকে বেরত দল বেঁধে। ঝকঝকে ট্র্যাক স্যুট পরা স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকত ময়দানের এখানে ওখানে ছিটিয়ে প্র্যাকটিস নিচ্ছে এমন ছেলেরা। পি কে ওদের আগ্রহ ও নিষ্ঠায় খুশী। এরই মধ্যে একদিন মাঠে গিয়ে দেখি হাতের পেট মোটা ব্যাগটা দু'পায়ের ফাঁকে রেখে একটা বেঞ্চে বসে ফাদার জর্জ ছেলেদের অনুশীলন দেখছেন একমনে। জিজ্ঞেস করলাম—'কেমন দেখছেন ছেলেদের ?'

'ভাল—অনেক প্রোগ্রেস হয়েছে।'

'টিম কবে যাচ্ছে মাদ্রিদে ?'

'প্রতিযোগিতা শুরু ১ তারিখ (জুলাই) থেকে, ৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে। ছেলেরা এখান থেকে দিল্লি যাবে ২৮ তারিখ, ২৯ তারিখ রওনা হবে মাদ্রিদ।'

'অফিসিয়াল কে কে যাচ্ছেন ?'

'দুজন—কোচ ও ম্যানেজার। কোচ অবশ্যই পি কে, ম্যানেজার এখনও ঠিক হয় নি।'

ফাদার জর্জের সঙ্গে কথা বলে প্র্যাকটিস শেষে মাঠ থেকে বেরোবার সময় দেখা পাতাম বাহাদুরের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করে জানলাম মাদ্রিদগামী স্কুল টিমে সম্ভাব্য যারা তাদের মধ্যে পাতামও একজন। শুধু ওই নয়, বাংলার আরও পাঁচটি ছেলের নামও বলল—বাবু দে, কাশীনাথ দাস, ভোলানাথ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও অলোক। পরে প্রদীপ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন—'হ্যাঁ টিমকে স্ট্রং করার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। যে যে পজিসনে টিম উইক মনে হয়েছে সেই পজিসনের জন্য এদের রাখা হয়েছে।'

কিন্তু যাবার দু'দিন আগে সব কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল। শুনলাম টিমের মাদ্রিদ যাওয়া অনিশ্চিত। কেন ? কোচ পি কে-র বক্তব্য—'টিমের এণ্ট্রি ফি পাঠাতে দেরী হওয়ার জন্য মাদ্রিদের কনফারমেশন পাওয়া যায়নি, ভারত অন্য দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে স্ট্যাণ্ডবাই আছে।' উনি যা বললেন—তা হোল। টিমের এণ্ট্রি ফি বাবদ ২৫০ ডলার পাঠাতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকাটা দিয়েছেন স্কুল বোর্ডের হাতে। কিন্তু ঠিকসময় মত টাকা না পাওয়ায় ও না পাঠানোর জন্যই বিপত্তি।

শেষ পর্যন্ত শিলং-এর ছেলেরা শনিবার যে যার বাড়ি ফিরে গেল ভাঙা মন নিয়ে, জল ভরা চোখে। যাবার আগের দিন ওরা নিমন্ত্রণ পেয়েছিল কোচের বাড়ি আনন্দ নয়, বিষাদে ভরা এক নৈশ ভোজ।

২৮ তারিখ বিকেলে গিয়েছিলাম 'মেঘালয় হাউসে।' দোতালায় উঠেই বাঁ দিকে দেড়খানা ঘর নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওরা শুয়ে বসে রেডিও শুনে সময় কাটাচ্ছে। প্রাণবন্ত ছেলেগুলির মুখে হাসি নেই। কথা বলতেও যেন উৎসাহ পাচ্ছে না। দলনায়ক অজয় থাপা ম্যানেজার ওয়েবর শোথানের সঙ্গে ফিরে যাবার টিকিট সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে বাইরে।

সপ্রতিভ ছেলে ফ্রাঙ্কি, দলের রাইট স্টপার। ও এগিয়ে এল। কিছু বলতে বললে বলল—'কি বলব ? খুব খারাপ লাগছে। দেড়মাস মন দিয়ে খাটলাম কিন্তু—' ওর গলাটা যেন ধরে এলো।

বললাম কবে জানতে পারলে যাওয়া হবে না—'ওনলি দিস মর্নিং—'

শনিবার (৩০ জুন) রাত্রে পি কে-র সঙ্গে যোগাযোগ করলে বললেন—'ছেলেরা চলে গেল। খুব খারাপ লাগছিল। ফাদার নেই—উনি শিলং-এ, ওর কাছ থেকে সব জানতে পারবেন। কদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন, অনর্থক অনেকগুলো টাকা ও পরিশ্রম নষ্ট হল।'

শেষ পর্যন্ত পি কে-র বিদেশ যাওয়া হোল না। এতে বোধহয় মোহনবাগান ক্লাব কর্মকর্তা ও সমর্থকরা খুশী। ক্লাব থেকে আগেই কোচকে বলা হয়েছিল মাদ্রিদ থেকে ৬ তারিখের মধ্যেই ফিরতে হবে কারণ ৭ তারিখ সেই 'খেলা'।

২.৭.৭৯

দ্বিজুদার আশেপাশে

যোগাড়-যন্তর



ওঃ সেদিন দ্বিজুদার খেলার মাঠে যাওয়াটাই প্রায় বানচাল হতে বসেছিল। সমস্ত যোগাড়-যন্তর বেলা সাড়ে তিনটের মধ্যে করা কি সোজা কথা? অবশ্য দ্বিজুদা 'অসম্ভব' বলে কোনো কথা তেমন মানেন না। একদিন প্রবল বৃষ্টিতে সমস্ত কলকাতা প্রায় ডোবে ডোবে। খেলা সেদিন বাতিল হবেই। সে যে খেলাই হক না কেন। কিন্তু ওই যে গোটা কয়েক টাকা পাওয়া যায় রেফারিগিরি করলে, সেটা এবং এক কাপ চা এবং কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায়। এই মুখ্য কারণে তিনি ভবানীপুর থেকে একটা মোটর গাড়ির ফোলানো টিউবে চড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল পর্যন্ত এসে বাকি পথটা হেঁটে মাঠে এসেছিলেন। তাছাড়া, দ্বিজুদা বলেন, একবার কথা দিলে সেকথা রাখা দরকার, তা নইলে দেশ এগোয় না। এক কালে ট্রামে, বাসে, ঠেলা গাড়িতে কারা সব লিখে রাখত দেশ এগিয়ে চলেছে, তখনও দেশ এগুতো না—এখন সেই লেখাগুলো মুছে যাবার পরও দেশ এগুচ্ছে না, কেননা দ্বিজুদার মত, কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্য তখন যা হত এখনও তাই হচ্ছে। তাই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দ্বিজুদা কথা দিলে তা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

সেদিনকার কথা বলি। সেদিন কলকাতা শহর বৃষ্টিতে ভাসেওনি, আর ভূমিকম্পও হয়নি। ভূমিকম্পের পূর্বাভাসও কিছু ছিল না। সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিলেনও মোটামুটি সকাল সকালই। তখনও ঘড়িতে ন'টা বাজেনি। দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই দ্বিজুদার খবরের কাগজে চোখ বোলানো এবং তিন কাপ চা শেষ। তারপর পাড়ার রকে বসে আড্ডা দেওয়া-টেওয়াতে বেলা সাড়ে বারোটাই বেজে গেল। কিন্তু তখনও হাতে সময় অনেক। কিন্তু কতকগুলো কাজ বাকি। তিনি বাক্স খুলে বছর সাতেক আগে বেনারস থেকে কেনা একটা বেশ ধারালো ছুরি বার করলেন। না, কথাটা ঠিক হল না। ধারালো ছুরি বার করে দেখলেন, তাতে মরচে পড়েছে। না, বোধহয় কথাটা এখনও ঠিক হল না—আসলে হবে সাত বছর আগে যে ধারালো ছুরি বাক্সে রেখেছিলেন, সেটা বার করে দেখেন তাতে মরচে পড়েছে। দেখে তার মন খুব খারাপ হল। আট টাকা দামের চমৎকার ওই ছুরিটিতে শান দেওয়ানোর জন্য তিনি ঘুঁটেকে ডেকে পাঠালেন। ঘুঁটে এসে হাজির হতেই তিনি বললেন, চটপট শান দিয়ে নিয়ে আসবি। আজ আবার খেলতে যেতে হবে কিনা।

তারপর চান-টান করে খেয়ে-দেয়ে যখন উঠলেন তখন প্রায় আড়াইটে। এখনও আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বিছানায় গড়িয়ে নেওয়া যায়। দ্বিজুদা অবশ্য ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন তার সদ্য শান দেওয়া চকচকে ছুরি।

দ্বিজুদা শুয়ে শুয়ে একটু তন্দ্রা আনিয়েছেন, এর মধ্যে হঠাৎ তিনি ঝটপট লাফিয়ে উঠলেন। আসল কথা দুটোই তিনি ভুলে গেছেন। তিনি চটপট তার জামা আর প্যান্ট পরে নিয়ে ছুটলেন পাড়ার বসন্ত সমাদ্দারের বাড়ি। বসন্ত সমাদ্দার উকিল, সেদিন কোর্ট বন্ধ থাকায় নাক ডাকাচ্ছিলেন। দ্বিজুদা তাকে ডেকে তুলে বললেন, বসন্তদা, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, রেডি তো? বসন্ত সমাদ্দার জানেন দ্বিজুদার কাজ বিনি পয়সার ব্যাপার। অর্থাৎ, আসলে দ্বিজুদাকে কোনো মতেই মক্কেল বলা যায় না। তাই তিনি হাসি মুখে বললেন, এই যে দ্বিজু এসে গিয়েছে—কিন্তু এত তাড়াহুড়ো লাগিয়েছ কেন—।

দ্বিজুদা বললেন, কেন, গত তিন মাস থেকেই তো বলে আসছি। তাড়াহুড়োটা কোথায় করলাম। আজ তো খেলা আছে। জব্বর খেলা। দারুণ কাণ্ড কারখানা হয়ে হয়ত আজই মরে যাব। তখন?

বসন্তবাবু বললেন, হ্যাঁ কথাটা ঠিকই বলেছ বটে। তবে আমি বলি কি আজ একটু সাবধানে থেকো, কাল পরশুর মধ্যে উইলটা ঠিকই করে রাখব।

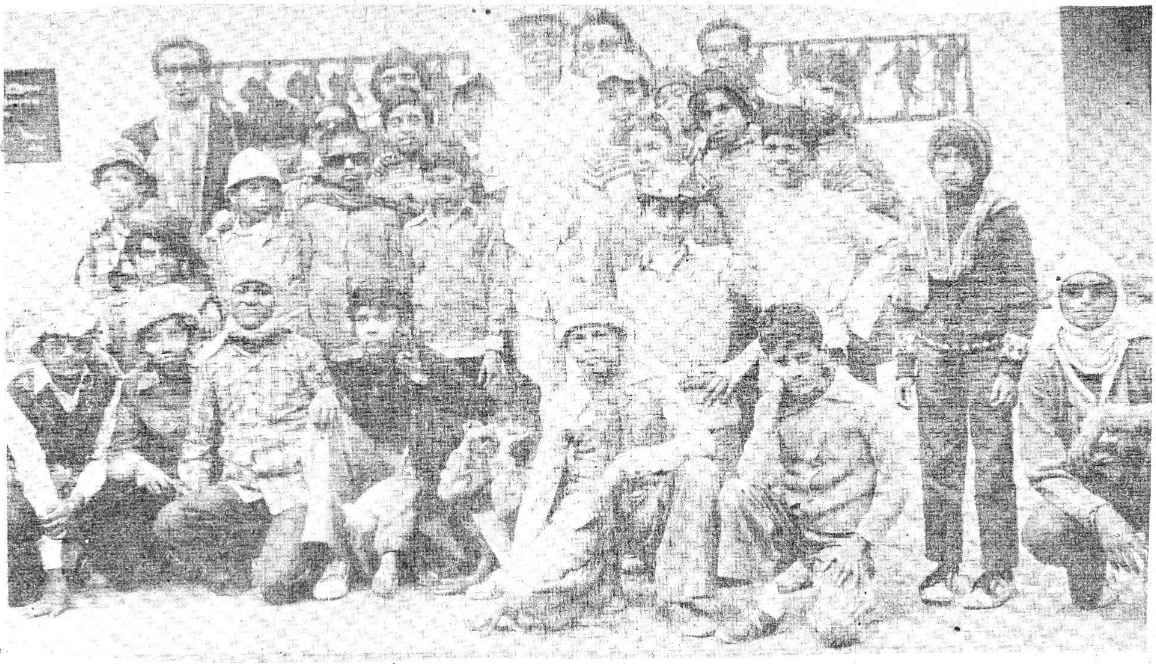
ইতিমধ্যে একটু বেশী সাবধানতা অবলম্বন করবে, আর কি বলব। এখন আমি একটু ঘুমুই, শরীরটে খুবই বেগ দিচ্ছে কিনা। বলে বসন্তবাবু চোখ বন্ধ করলেন।

দ্বিজুদা দেখলেন বসন্তবাবুকে দিয়ে সেদিন কোনো কাজ হবে না। দ্বিজুদার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বসন্ত সমাদ্দার কথা দিয়ে কথা রাখলেন না এটা তার ভারি অন্যায় মনে হল। কিন্তু বসন্ত সমাদ্দারের ওই কথাটা তার খারাপ লাগল না—আজ একটু বেশী সাবধান হতে হবে বলে তিনি যে উপদেশ দিলেন, সেটা নেহাত খারাপ বলেননি তিনি।

দ্বিজুদা আর সময় নষ্ট করলেন না। তিনি পাড়ার মস্তান শঙ্খচূড়ের কাছ থেকে দুটো বোমা ধার চেয়ে নিলেন। বললেন, ভাই, ব্যবহার-ট্যবহার হয়ত করতে হবে না। না হলে তো ভালই সন্ধ্যে ফেরত পেয়ে যাবে। আর দরকার হলে এর জন্য ন্যায্য দাম যা হয় তা তোমাকে দিয়ে দেব কেমন।

সেদিন খেলা শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগেই দ্বিজুদা মাঠে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পাড়ার মহেশবাবু হাওড়ায় যাচ্ছিলেন গাড়িতে করে। ওই গাড়ি না পেলে ঠিক সময় পৌঁছনো ভারি শক্ত হত।

দিগদর্শক



দার্জিলিং মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের সামনে তেনজিং নোরগের সঙ্গে এক্সপিডিসনের সদস্যরা / সুধীন পাল

জড়বুদ্ধি, মূক–বধিরদের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে শৈলারোহণ

আরোগ্য নিকেতন হিমালয়ের বিশালত্ব, মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক শোভা, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শৈলারোহণের কষ্টকর পরিস্থিতি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রতিবন্ধী, মূক বধির শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই এ ধরনের ২৬ জন স্কুল ছাত্রকে (যাদের বয়স ৮ থেকে ১৩) নিয়ে উত্তর কলকাতার মিলন সমিতি (হৃষিকেশ পার্ক) ক্লাব মে মাসের শেষার্ধে দু'সপ্তাহের এক হিমালয় অভিযান সংগঠিত করেছিল।

উদ্যোক্তারা এর নাম দিয়েছে 'মাউন্টেন থেরাপি' অভিযান। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষকে উপলক্ষ্য করেই উদ্যোক্তারা এই চিকিৎসা অভিযান করে।

১৮ মে এরা (মোট ৩৭ জন) যাত্রা করে



শিশু সদস্যরা ১২৫০০ ফুট ওপরে দুর্গম রাস্তায় হেঁটে চলেছে / প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়

দার্জিলিং-এর হিমালয়ের 'সন্দকফু-ফালুট' রিজিয়নে প্রায় ১২৫০০ ফুট অতিক্রম করে ৩ জুন কলকাতা ফিরে আসে। এই গবেষণামূলক অভিযানে অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ, দেহতত্ত্ববিদ, ডাক্তার এবং পর্বতারোহীরা ছিলেন।

এরা অভিযাত্রী শিশুদের উপর উচ্চতর হিমালয়ের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, মনে করছেন, অভিযানটি শিশুদের মানসিক ও শারীরিক উভয় দিকেই উন্নতি ঘটিয়েছে।

গবেষণা হয়েছে মূলত ওই শিশুদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কবোধ গড়ে তোলা, পরিবেশের প্রভাবে মননশীলতার উন্নতি আনা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা ফিরিয়ে আনা, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটানো, আচরণের পরিবর্তন ঘটানো এবং সক্ষম শরীরের উপর পর্বতারোহণ কী পরিবর্তন আনে সে সম্পর্কে অবহিত করা প্রভৃতি।

ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশন, রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তর, বোধিপীঠ ও আই-ডিয়াল স্কুল, সায়েন্স কলেজের ফিজিওলজি ও সাইকোলজি বিভাগ সহ বহু প্রতিষ্ঠান আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য মিলন সমিতির এই অভিযান সফল করতে সাহায্য করেছে। অবশ্য অভিযাত্রীরাও সামর্থ অনুযায়ী অর্থাদি দেয়।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে চৌধুরী (ভি এম) ও শ্রী তেনজিং নোরগে প্রমুখ এই অভিযানের মৌলিকত্ব সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং বলেন, পর্বতারোহণ ও উচ্চতর হিমালয়কে এইভাবে জনহিতকর কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য।

কলকাতায় ফিরে আসার পরও অভিযাত্রী শিশুদের নিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখা হচ্ছে উচ্চতর হিমালয় ও পর্বতারোহণ শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্থায়ী উন্নতি সাধন করতে পেরেছে কিনা। এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রতিবন্ধী ও মূকবধিরদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

ভারতে এ ধরনের উদ্যোম আগে হয়েছে বলে অভিযাত্রীরা অন্তত জানেন না। দলের নেতা ছিলেন প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়। দশজন কর্মকর্তা শংকর প্রসাদ বিশ্বাস, সঞ্জিৎ মিত্র, মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জিৎ পালিত, চন্দন বসু, রণেন রায়, সুধীন পাল, ডাঃ কুণাল দত্ত, মৈত্রী মিত্র ও চিত্রলেখা ভট্টাচার্য। ২৬ জন ছাত্র অভিযাত্রী—কুণাল চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ পাইন, গোপাল, দেবাশিস সান্যাল, অরবিন্দ চক্রবর্তী, অনীশ মিত্র, বেতাই, খগেন, বিষ্টু দলুই, অভিজিৎ চক্রবর্তী, দেবাশিস মিত্র, অঞ্জন ভৌমিক, সুনীল চোমল, অনিল চোমল, প্রবীর চন্দ, সুব্রত রায়, সঞ্জয় মুখার্জি, শ্যামসুন্দর গুপ্তা, প্রদীপ দাস, অমিত সরকার, সঞ্জয় ব্যানার্জি, অর্ধেন্দু দাস, সঞ্জীব জৈন, রাজীব জৈন, কৌশিক তালুকদার ও উত্তম দাস।

সেলিম, তারলোক, নায়াররা আর কতকাল এইভাবে কাটাবেন

৮ জুন ১৯৭৯ সংখ্যায় বিনু চ্যাটার্জির লেখা 'সেই সেলিম সত্যই কি অবাঞ্ছিত? কেন তিনি বলেন : খোদা আমাকে টেনে নাও' এই রচনাটি পড়ে দুঃখে ভেঙে পড়েছিলাম। এই ধরনের হৃদয়-বিদারক রচনা পরিবেশনার জন্য খেলার আসরের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। এর আগে এই ধরনের আরও অনেক রচনা খেলার আসরের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি; যেমন গত ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮-এ প্রকাশিত 'রানার'—যেটি লেখা হয়েছিল এককালের বিখ্যাত দৌড়বীর যিনি জাকার্তা এশিয়ান গেমসের হাজার মিটার দৌড়ে ভারতকে একটি সোনার পদক উপহার দিয়েছিলেন। সারাদেশ সেদিন তারলোক সিংকে নিয়ে উৎসবে মেতে-ছিল; কিন্তু বারো বছর পরে যখন এই দৌড়-বীর ক্যানসারে অনাদরে অবহেলায় মারা গিয়ে-ছিলেন; সেদিন দেশ তার জন্য কি করেছিল? ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮-এর সংখ্যাতেই 'সেই নায়ারকে কেউ চেনে না' পড়লে নিজেদেরকেই অপরাধী বলে মনে হয়। এরকম উদাহরণ আরও অনেক আছে যেগুলো খেলার আসরের মাধ্যমেই কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কেন এ রকম হবে? দেশের সম্মান রক্ষার জন্য যারা নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত খুইয়ে দেন—খেলোয়াড়ী জীবনের শেষে একদিন তারা কোথায় তলিয়ে যান—তার হিসাব আমরা রাখি না কেন?

আমার মনে হয় এর জন্য দায়ী সরকার এবং সেই সমস্ত অকৃতজ্ঞ দলের পরিচালকগণ যাদের জন্য একজন খেলোয়াড় জীবন-মরণ সংগ্রাম করে দেশকে জিতিয়েছেন।

সরকারের ক্রীড়াদপ্তর এবং বড় বড় দলের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমীদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। এখনকার ক্রীড়াপ্রেমীরা তাদের প্রিয়দল হেরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভাঙচুর আরম্ভ করে দেয় এবং দর্শকে দর্শকে বেধে যায় হাতাহাতি। যদি এই বিরাট সংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমীরা অতীতের সুবিখ্যাত খেলোয়াড়দের জন্য জনমত সংগ্রহ করে সরকারের ক্রীড়া-দপ্তরকে, আই এফ এ-কে এবং বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষকে চাপ দেয় তাহলে সেলিমের মত এই 'অবাঞ্ছিত' খেলোয়াড়দের অন্তত পক্ষে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহম্মদ নাসিরউদ্দিন, চটা কালিকাপুর, বাটানগর, ২৪ পরগণা।

(২)

৮ জুন 'সেই সেলিম সত্যিই কি অবাঞ্ছিত' পড়ে ভীষণ দুঃখ পেলাম। পেলাম প্রাণের গভীরে দারুণ ব্যথা। যে সেলিম সাহেবের খেলা দেখার জন্য কলকাতার (কলকাতার বাইরেও) হাজার হাজার দর্শক, গণ্য-মান্য মাঠের কর্মকর্তারা পর্যন্ত উৎসুক হয়ে থাকতেন, যে সেলিম সাহেবকে বিদেশী ফুটবল কোচেরা আখ্যা দিয়েছিলেন (দি স্কটিশ ডেইলি এক্সপ্রেস আগস্ট ২৯, ১৯৩৬) 'ইণ্ডিয়ান জাগলার' (তার নিউ স্টাইলের জন্য), অথচ সেই প্রবীণ বাঘা খেলোয়াড়কে আজ আমরা, তথা বাঙালীরা অনেকেই চিনি না। তার খোঁজও আজ আমরা অনেকেই রাখি না। তাইতো সেই প্রবীণ বাঘা খেলোয়াড় খেলার মাঠে এসে একটা টিকিট পান না। তবে মোহনবাগান ক্লাবকে ধন্যবাদ যে, তারা এখনও সেলিম সাহেবকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা দিচ্ছেন।

ছোটবেলায় স্কুল জীবনের একটা কবিতা আজ ভীষণ ভাবে মনে পড়ছে।

'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে
মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে।'

তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সত্যিই কি আমরা একজন ভাল খেলোয়াড়কে প্রাণ থেকে ভালবাসি? না তাদের ভাল লাগে? কোনটা?—

স্বপন কুমার ঘোষ, (ইণ্ডিয়ান নেভি), আই এ টি গিরিনগর, পুনে-৪১১০২৫।

ইণ্ডিয়া সকার অ্যানুয়াল

আমি 'খেলার আসরের' একজন নিয়মিত পাঠিকা। সুতরাং পাঠকের জন্য যে পৃষ্ঠা বরাদ্দ আছে তাতে কিছু লেখবার অধিকার নিশ্চয়ই আমি দাবী করতে পারি। আপনাদের প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া সকার অ্যানুয়াল ৭৯' পড়লাম। অবশ্যই মনোযোগ সহকারে। ভিতরের কোন লেখা সম্বন্ধে কোন বক্তব্য আমার নেই। প্রত্যেকটি লেখাই উচ্চপ্রশংসনীয়। এর মধ্যে নারায়ণ ওঝা-র দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অফ মহমেডান স্পোর্টিং' বেশ ভালো লেগেছে। বর্তমানে এই টিম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখা হয় না। সেইদিকে তাকিয়ে উনি যে লিখেছেন তারজন্য নিশ্চয় উনি প্রশংসা দাবি করতে পারেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে বইটি যখন 'ইণ্ডিয়া সকার' তখন এর প্রচ্ছদে কি এশিয়ান গেমসের ছবি দিলে ভালো হোত না? ফাইনালের চেয়েও আই এফ এ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল বনাম আরারাতের খেলাটি কি বেশী পরিচ্ছন্ন পরিমার্জিত হয়েছিল? তাই আমার বক্তব্য পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে সবার দিকে সমান দৃষ্টি দিন।

নিবেদিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

অবসরপ্রাপ্তদের সাহায্য দিন

আমি জেনেছি যে, অবসরপ্রাপ্ত প্রতি-ভাবান খেলোয়াড়দের ব্যাপকভাবে 'সরকারী কোন অনুদানের ব্যবস্থা' নেই।

আমার মনে হয় ওই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সরকার তরফ থেকে একটি যৎসামান্য অনুদানের ব্যবস্থা করলে তারা তাদের আর্থিক অনটন থেকে মুক্ত হয়ে দেশের জন্য জাতি গঠনে এগিয়ে আসতে পারবেন।

প্রদীপ কুমার নিয়োগী, চাঁপাবুই, হুগলী।

সৈন্যরা ডিসিপ্লিণ্ড নয়?

আমি জানি আমার মত একজন 'সৈনিক' পাঠকের চিঠিটা আপনার কাগজে ছাপা হবে না। তবুও লিখছি যে আপনার মত একজন গুণীলোকের তো ব্যাপারটা জানা থাকলো।

১ জুন পাঠকের কলমে প্রকাশিত 'সৈন্যরাও ডিসিপ্লিণ্ড নয়', লেখক মনোরঞ্জন কর্মকার মহাশয়ের চিঠির প্রতিবাদ জানাচ্ছি। উনি ডিসিপ্লিণ্ড সম্বন্ধে সৈন্যদের জ্ঞান দিয়ে বলেছেন যে সৈন্যরা ডিসিপ্লিণ্ড নয়। তার মনে রাখা উচিত যে এ দেশে ডিসিপ্লিণ্ড যদি কোথাও থাকে তবে তা একমাত্র সৈনিক বিভাগেই আছে। উনি ডিসিপ্লিণ্ড বলতে কি বলতে চাইছেন? যদি টিম-এর কোন খেলোয়াড় অসৎ আচরণ করেন তবে তার প্রভাব টিমের উপরেই পরে বা পরা উচিত। কিন্তু কোন সাহসে উনি দেশের সমস্ত সৈন্যকে আন ডিসিপ্লিণ্ড বলেছেন। এবারকার বেটন এর এ এস সি টিম-এর সবগুলি খেলা আমি দেখেছি। সেই প্রসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি।

১। কোয়ার্টার ফাইনালে ট্রাইবেকারে আর্মি দলের গোলরক্ষক দুটো বল সেভ্ করা সত্ত্বেও আম্পায়ার রি-পুশ দিলেন কেন?

২। ফাইনালের প্রথম দিন অর্থাৎ প্রথম লিগ-এ আর্মি দল জয়ী হয়েও জয় পায়নি, ড্র করা হলো কার ভুলে বা কাদের স্বার্থে?

৩। ফাইনালের দ্বিতীয় দিন যে গোলটা নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত সেটা কি ন্যায়সঙ্গত গোল ছিল? না অফ সাইড গোল ছিল?

৪। ওলিম্পিক খ্যাত গোলরক্ষক দ্বারা আম্পায়ার প্রহৃত ঘটনাটা নিন্দনীয়। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল উক্ত গোল-রক্ষক সম্বন্ধে বেঙ্গল হকি অ্যাসো-সিয়েশন কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে নীরব কেন?

৫। বেটনের আম্পায়ারিং উঁচুমানের ছিল

পাঠকের কলমে

কি? এই জন্যই কি ঐতিহ্যশালী বেটন কাপের আজ এ দশা? বেটনে বাইরের নামী দল আসে না কেন?

৬। 'অর্জুন' পুরস্কার প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন হরচরণ সিং কেন বলেছেন আমার টিম কলকাতার বেটন কাপ খেলতে আর আসবে না?

সমীর কুমার পাল, এ এস সি ফুটবল টিম, গয়া (বিহার)।

নিজের দোষ দেখা উচিত

বিগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক খেলার আসরে ভারতের ইতিহাস শুধুই অসাফল্যের। এর কারণ হিসেবে আমরা শুধু সরকারকেই দায়ী করি। আমার মনে হয় বর্তমান খেলো-য়াড়দের অসংযম ও নিষ্ঠার অভাবও খুব কম দায়ী নয়। বিশ্বের সেরা ফুটবলার পেলে কল-কাতায় এসে তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'মদ, সিগারেট ছুঁয়ো না। কোচের কথা মেনে চলো। নিষ্ঠা ভরে অনুশীলন করে যাও।' মনে প্রাণে বর্তমান ক'জন খেলোয়াড় এ রীতি মেনে চলেন জানি না। প্রসঙ্গক্রমে টেনিসের বিস্ময় বিয়র্ণ বর্গের নিষ্ঠার কথাও উল্লেখ করতে হয়। মহম্মদ আলীও নর্টনের কাছে হারার পর বলেছিলেন, 'অসংযমই আমার ব্যর্থতার মূল কারণ'। অথচ আমাদের বর্তমান খেলোয়াড়রা নিষ্ঠা, সংযম, অনুশীলন ভুলে গেছেন। ব্যর্থ হলেই কোচ, না হয় কর্মকর্তাদের ওপর দোষ চাপিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন। দোষ তাদের নেই—একথা বলছি না। তবে পরের দোষ দেখার আগে নিজের দোষটা দেখলে মনে হয় ভালই হবে। অন্যতম খেলোয়াড় চুনী গোস্বামীও একটা পত্রিকায় বলেছেন, আমাদের অসাফল্যের কারণ চ্যালেঞ্জের অভাব নয়, অভাব আন্ত-রিকতার, নিষ্ঠার।

সুতরাং আমরা নিজেরা যদি সাচ্চা হয়ে উঠি মনে হয় তখন কর্মকর্তা বা সরকারের অসহযোগিতার মনোভাব দূর করতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

অসীম কুমার ঘোষ, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪

বুমেরাং

১ জুন খেলার আসরে চম্পা সেনগুপ্ত ও অন্যান্যদের লেখা চিঠিটা পড়ে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।

নীলিমা দেবীর চিঠির উত্তরে বলি সব কিশোরীরা খেলোয়াড়দের বয়ফ্রেণ্ড মনে করে না। যদিও আমার জন্ম এই বাংলায় নয়, সেই দেরাদুন থেকে এসেছি কয়েক বছর আগে। আমিও একটা দলকে ভালবাসি। সব দলের খেলোয়াড়দেরও আমি ভালবাসি। যেমন শ্যাম, সুরজিত বা লতিফকে, তেমনি ভালবাসি বিশ্বজিৎ বা বিষ্ণু মাণ্ডির মত অসুস্থ খেলোয়াড়কে। তাই বলে নিশ্চয় আমার উচিত হবে না তাদের কাছে ভালবাসার নিদর্শন মত অটোগ্রাফ বা অ্যালবাম চেয়ে পাঠান। ভূতপূর্ব অধিনায়ক বা উদীয়মান স্ট্রাইকার যেই হোক না কেন তারা তো কাঠের পুতুল নয়। তাদের মধ্যে কি প্রেম ভালবাসা, দয়া, দুষ্টুমি থাকতে নেই? সেগুলো প্রকাশ করলে তাদের ইমেজ ধূলায় লুটোবে? হাজার হোক অটোগ্রাফের খাতা বা অ্যালবাম পাঠানো কি উচিত হয়েছে? তাদের কাছে যদি পাঠানো যায় তাহলে খাতায় অশ্লীল ছবি বা টেলিফোনে জ্বালাতন —এ আর এমন কি। যেমন সবজান্তার মত সাহস ভরে পাঠানো হয়েছে তেমনি ঠিক হয়েছে।

প্রিয়াঙ্কা ম্যাকলিয়ড, কৃষ্ণনগর।

শ্রদ্ধার চোখে দেখি

১ জুন 'খেলার আসরে' পাঠকের কলমে চম্পা, শুচিস্মিতা এদের লেখাকে আমরাও সমর্থন করছি। কারণ প্রত্যেক খেলোয়াড়কে আমরা শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করি। আমরা কখনও খারাপ দিক দিয়ে আলাপ আলোচনা করতে চাই না; জানি, তারা একজন ভারতীয় সম্মানের উজ্জ্বল পদক! খেলোয়াড়রা নিজেরাই নিজেদের মনকে অন্যভাবে নিয়ে থাকেন। আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি বলেই আমরা চাই তাদের অটোগ্রাফ, চাই তাদের দেখা। আমাদের এটা কোন- দোষই নয়। নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উচ্চবিত্ত কিশোরী ফ্যান' এই সিদ্ধান্ত সর্বান্তকরণে মিথ্যা আমাদের মতে।

রত্না হাজরা, কলকাতা-৩৪।

রেফারিদের পারিশ্রমিক ৫০ টাকা হওয়া উচিত

৮ জুন ১৯৭৯ খেলার আসরে রূপক সাহার রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি'র কথা পড়লাম। খুব ভালো লাগলো। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট পেলাম এই ভেবে যে, যাকে প্রত্যেক খেলায় দশ বারো মাইল করে দৌড়তে হয় এবং যার অক্লান্ত পরিশ্রমে একটা খেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয় তার পারিশ্রমিক মাত্র সাত টাকা! রেফারিদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ কমপক্ষে প্রতি খেলায় পঞ্চাশ টাকা হওয়া উচিত।

দীপেন ঘোষ, মদনপুর, নদীয়া।

নামী দল আমাদের বঞ্চিত করেছে !

বাঙালী খেলা পাগল। বাংলা ফুটবলের মক্কা। বাঙালী প্রিয় দলের (তিন-প্রধান) খেলোয়াড়দের নয়নের মণি তুল্য মনে করে।

আমরা উচ্ছাস প্রবণ জাত, ইমোশন্যাল। রাত্রি জেগে টিকিট কাটি, লাইনে জলের জন্য হা-পিত্যেশ করি, মাউন্টেড পুলিশের চাঁট খাই। সব সহ্য করি প্রিয় খেলোয়াড়দের ভাল খেলা দেখার জন্য। হায় বাঙালী ! কতবার বঞ্চিত হবে তুমি !

গিয়ে কি দেখি ! খেলোয়াড়দের অভদ্র আচরণ, রেডিওতে কমেনটেটারদের দুর্বল ভাষাশৈলী এবং গলার স্কেলিংয়ে খেলার দ্রুতগতি (একমাত্র বোঝার রাস্তা রেডিওতে) : প্লেসিং বা স্যুটিংয়ের বদলে দুর্বল সট, তাই আবার কমেনটেটার-এর কায়দায় ইনসুয়িং, সোয়ার্ভিং হয়ে যায়।

সব দিকেই বঞ্চিত আমরা ! শুনেছি এর মধ্যে কয়েকজন পঞ্চাশ হাজারী মনসবদার (এক্সট্রা—ব্যাংকের চাকরি, বন্ধুর চাকরির সুপারিশ, দশখানা নিয়মিত ডে-স্লিপ, গাড়ি করে যাতায়াত, ভাল খানা পিনা, মন খারাপে সিমলা টুর) আছেন। তারা আমাদের বঞ্চিত করেছেন ব্যর্থতায়।

রতন রায়, বসিরহাট

'বা-পা-ই-কে'—শ্রেষ্ঠ কেন ?

১ জুন খেলার আসর-এ 'পাঠকের কলমে' বিভাগে সেরা চিঠির পুরস্কার পেয়েছেন অভিজিৎ সরকার (খাগড়া, মুর্শিদাবাদ)। এমন একটা অদ্ভুত অবাস্তব চিঠি সেরা চিঠির মর্যাদা কি করে পেল এটা ভেবে আমরা অবাক না হয়ে পারলাম না। 'সেরা চিঠি' যারা নির্বাচন করেন তাদের প্রতি সম্পূর্ণশ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে এত বাজে নির্বাচন এর আগে হয়নি। শ্রীসরকারের বক্তব্য—এবার জাতীয় ফুটবলে বাংলার নাম রাখতে হবে 'বা-পা-ই-কে' যেহেতু এবার কলকাতায় পাঞ্জাব, কেরল ও ইরান থেকে ফুটবলাররা খেলতে এসেছে। কি অবাক করা কথা ! এই জন্যই বাংলার নাম পাল্টে যাবে ! আর আপনারা কিনা এই চিঠিকেই 'সেরা' বলে নির্বাচিত করলেন ! আচ্ছা, এমন কোন বছরের কথা মনে পড়ে কি যেবার সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দল পুরো বাঙালী বা বাংলার জাত খেলোয়াড়দের নিয়েই গঠিত হয়েছিল ? এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরই বাংলার বাইরের বহু খেলোয়াড় বাংলার হয়ে খেলেছেন, এখনও খেলছেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৪৫ সালের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলে ছিলেন—টি আও, তাজ-মহম্মদ, আপ্পারাও—এরা কেউই বাংলার লোক ছিলেন না। আর ছিলেন এস পাগসলে—উনি বাংলা তো বটেই ভারতেরও বাইরের খেলোয়াড়। তখন কিন্তু কেউই বলেননি, 'বাংলার নাম কি রাখা হবে ?' কারণ একথা ক্রীড়ামোদী কোন বাচ্চা ছেলেরও জানা যে যখন বাংলার বাইরের, সে অন্য রাজ্যের বা দেশের, কোন খেলোয়াড় আই এফ এর পক্ষে দল বদলের জন্য আবেদন করে এবং তার আবেদন যদি গ্রাহ্য হয় ও কলকাতার 'লিগ' ফুটবলে কোন টিমের হয়ে খেলে তখন সে বাংলারই সম্পত্তি হয়ে যায়। এই কারণে আমাদের মত এই যে, যতই বাইরের খেলোয়াড় খেলুক না কেন, 'জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দল' বাংলা নামেই চিরদিন খেলে যাবে।

অরূপ ও অমিত দত্তগুপ্ত,
কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

বা-পা-ই-কে-না

১ জুন অভিজিৎ সরকার (খাগড়া, মুর্শিদাবাদ) লিখেছেন 'বাংলা দলকে এবার এক ভিন্ন এবং অসম্ভব অদ্ভুত নামে অবতীর্ণ হতে হবে এবং নামটি হল 'বা-পা-ই-কে'।

কিন্তু তিনি ভুলবশতই নাইজেরিয়ার খেলোয়াড় ডেভিড উইলিয়ামসকে বাদ দিয়েছেন। তার 'বা-পা-ই-কে' নামটি যদিও যথোপযুক্ত হয়েছে তথাপি নামটি 'বা-পা-ই-কে-না' হলেই আরও যথাযথ হত। ডেভিড উইলিয়ামসকে বাদ দেওয়ায় নামটি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ডেভিড উইলিয়ামসের মত এত বড় খেলোয়াড়কে কি বাংলা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

সোমা রক্ষিত, মছলন্দপুর, ২৪ পরগণা।

আন্তঃএঞ্জিনিয়ারিং ফুটবলে

'খেলার আসরের' ৮ জুন সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠায় গৌতম ঘোষের লেখা 'আন্তঃএঞ্জিনিয়ারিং ফুটবলে আবার যাদবপুরের জয়' শীর্ষক রচনায় কয়েকটি ভুল তথ্যের সংযোজন আমাদের চোখে পড়লো। ভুলগুলি নিচে দিলাম।

১। যে ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি ওই প্রতিযোগিতার ছবি নয়। ছবির নিচে লেখা আছে ডানদিকে যাদবপুরের ডেভিড উইলিয়মস। ডেভিড যাদবপুরের ছাত্র কিন্তু ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি। কাজেই ডেভিডের গোল করার কোন প্রশ্ন নেই।

২। শৈলেন মান্না সভাপতি হিসেবে ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অরবিন্দ নাথ বসু। প্রধান অতিথির নাম ছাপা হয়েছে টি সোমের (বাঘা), উনি উপস্থিত ছিলেন না।

৩। প্রতুল চক্রবর্তী ও রত্নাকর ঘোষের নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে রেফারি ও অন্যতম লাইন্সম্যান হিসাবে। এটাও ভুল তথ্য।

৪। সর্বোচ্চ গোলদাতার কোন পুরস্কার দেওয়া হয়নি এবং যাদবপুরের অধিনায়ক মৃদুল চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেনি। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে বি ই কলেজের বিশ্বজিত পালিত।

সবশেষে জানাই যে আটটির বদলে পাঁচটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিযোগিতায় লিগের পর্যায়ে খেলেছে। যাদবপুর ও বি ই কলেজ সমান সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করায় প্লে অফ খেলা হয়। যাদবপুর ৫—৩ গোলে জয়ী হয়। ৬—৩ গোলে নয়।

লেখকের সংবাদের সূত্র কে আমরা জানি না। তবে আমাদের অফিসে এসে আসল ঘটনা জানতে পারতেন।'

রবীন্দ্র কুমার সেন, ডাইরেক্টর, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকসন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

[তথ্যগুলি যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং-এর অধিনায়ক মৃদুল চক্রবর্তী আমাকে জানিয়েছিলেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি এমন ভিত্তিহীন খবর দেবেন নিজের নাম প্রচারের জন্য বুঝতেই পারিনি। আশা করি পাঠকবর্গ আমাকে ভুল বুঝবেন না—গৌতম ঘোষ]

বেতারে ফুটবল

গতকাল (১২-৬-৭৯) ইস্টবেঙ্গল ও রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের খেলার প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল মোটেই সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারছিল না। ভাষ্যকার বলছিলেন : 'যে ইস্টবেঙ্গলকে আমরা জানি, জার্সি না থাকলে কখনই বুঝতাম না যে সেই ইস্টবেঙ্গল আজ মাঠে খেলছে।' এ বেশ ভাল কথা—এ তিনি অবশ্যই বলতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন বললেন, 'দেবরাজের ইস্টবেঙ্গলের মত দলে খেলার যোগ্যতা আছে কিনা আমার বিস্তর সন্দেহ আছে।' তখন তিনি তার সীমা অতিক্রম করে গেলেন। আর কি আশ্চর্য দেখুন, যখন দেবরাজ দ্বিতীয়ার্ধে খুব ভাল খেলল সেই তিনিই তখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

আমার কথা হল, যারা ভাষ্যকার তারা এমন কিছু বলবেন না যা তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে নয়। কাউকে নির্বাচন করা না করা সে ক্লাবের ব্যাপার—তারাই ভালো বুঝবেন। আমাদের বাক্ স্বাধীনতা (হয়ত আকাশবাণীও এই স্বাধীনতা ওদের দিয়েছে) আছে—এর অর্থ এই নয় যে, আমরা যা খুশী বলে যাব। এতে অনেক সময় বিস্তর ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। হাজার হাজার দর্শক মাঠের বাইরে ও ভিতরে ওদের বিবরণী শুনছেন। এমনিতেই প্রিয় দল খারাপ খেলছে বলে ওরা বিরক্ত তারপর এই সব আজেবাজে কথা শুনে ওরা এবং ওদের সঙ্গে বেশ বড় একটি জনতা যে সেই ক্লাব ও খেলোয়াড়টির প্রতি মারমুখী হয়ে উঠতে পারেন, একথা কেন ভাষ্যকাররা ভুলে যান, আমি বুঝতে পারি না।

দেবাশিস চ্যাটার্জি, মুরি, রাঁচি।

(২)

আমরা ফুটবল ভালবাসি এবং অবশ্যই কোন একটি বড় দলের সমর্থক সন্দেহ নেই। তাই বলে ছোট ছোট দলগুলিও যে আমাদের সমর্থন পায় না তা নয়। ১২ জুন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বনাম রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের লিগের খেলার বাংলা ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে একটি জায়গায় ভীষণ খারাপ লাগল যখন রেলওয়ে দল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে আচমকা একটি গোল করে বসলো। তখন ভাষ্যকারও যেন ক্লাব সমর্থকদের সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেলেন। অথচ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যখন প্রথম গোল করলো তখন সমর্থকদের আনন্দোল্লাসের সঙ্গে তিনিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে দল, খেলা ও খেলোয়াড়গণের গুণাগুণ বর্ণনা করতে শুরু করে দিলেন। ছোট দলগুলি কি সবদিক দিয়েই বঞ্চিত ? দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও রেলওয়ে দল যে তখনও ভেঙ্গে পড়েনি এবং কোমর বেঁধে লড়ে একটি তারকাখচিত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে গোল করেছে তখন ভাষ্যকারগণের কি উচিত ছিল না ওই অসম 'দল'টি এবং গোলটি সম্বন্ধে কিছু বলা ? আমরা অবশ্যই আশা করেছিলাম তাদের কাছে। কিন্তু নিরাশ হয়েছি। তাই সমস্ত ভাষ্যকারগণের নিকট আমাদের আবেদন কোন ক্লাবের খেলায় একপক্ষ অবলম্বন না করে নিরপেক্ষভাবে ধারাবিবরণী দিলে আমরা ভীষণ আনন্দিত ও খুশী হব।

দিলীপ পাল, শ্রীকান্ত দাস, নিতাই রায় এবং শ্রীনিবাস সিংহ, রামজীবনপুর, কোলিয়ারী, সীতারামপুর, বর্ধমান।

লেখা চুরি

১১ মে সংখ্যাতে দেখলাম সেরা চিঠির জন্য গিফট চেক (১১ টাকার) পেয়েছেন টেলকোর দেবাশীষ চক্রবর্তী। এর জন্য আমি কিন্তু শ্রীচক্রবর্তীকে অভিনন্দন জানাতে পারছি না। কারণ উনি আপনাদের ঠকিয়েছেন। যদি 'দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৪'-র ১৯৮ পাতা খোলেন তবে দেখতে পাবেন, শচীন সেন লিখিত 'ফুটবলে ঘটি বাঙাল' নামে একটি ফিচার। প্রথম তিনটি প্যারাগ্রাফ পড়ুন। অবশ্যই বুঝতে পারবেন শ্রীচক্রবর্তী ওই লেখাটি থেকে শেষের মাত্র সাতটি শব্দ বাদ দিয়েছেন।

ইন্দ্রনীল সরকার, শান্তনু বসু এবং চঞ্চল ব্যানার্জি, ধানবাদ।



অনসূয়া বাঈ প্রসঙ্গে

কঠোর পরিশ্রম করলে কখনও মেয়েদের শারীরিক বিশেষ কোন পরিবর্তন আসে না, তবে ডোপিং-এর সাহায্য নিলে অনেক কিছু অঘটন ঘটতে পারে। সাধারণত ওষুধের সাহায্যে আজকাল ছেলেমেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের ওজন বাড়াতে পারছে। তার জন্য তারা আরও বেশী 'ওয়ার্ক লোড' করতে পারছে এবং তাতে তাদের ফল ভালই হচ্ছে। ওই ওষুধ Sex Steroid হরমোনকে খুব বেশী করে উৎপাদন করতে সাহায্য করছে। তাতে ছেলেদের ব্যাপারে Testosterone এবং মেয়েদের Estrogene এবং Progesterone নামে hormone গুলো খুব বর্ধিত আকারে সক্রিয় হয়। (Prody Protein) শরীরে খুব বেড়ে যায়, তাতে androgenic কাজ খুব সাহায্য করে, aggressiveness এবং খাটবার ও প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। কিন্তু পরে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মেয়েদেরও ছেলেদের মতন শারীরিক গঠন তৈরি হতে আরম্ভ করে। যেমন—মাংসপেশীগুলো ছেলেদের মতন হয়, গলার স্বর গম্ভীর এবং কর্কশ হয়, শরীরে অত্যধিক লোমের সমাগম ছাড়াও চামড়ার তৈলাক্তভাবও অনেক বর্দ্ধিত হয়। cromosome সাধারণত কম বেশী হয় না। তবে এ বিষয় নিয়ে এখন রিসার্চ হচ্ছে। কোন ওষুধের সাহায্য না নিয়ে নির্ভয়ে মেয়েদের কঠোর ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে।

সুজিত সিংহ

[সেরা চিঠির জন্য ১১ টাকার গিফট চেক পাবেন বাটানগরের মহম্মদ নাসিরউদ্দিন]

পাটনায় জাতীয় ব্রিজের প্রস্তুতি

পাটনা থেকে সমীর সেনগুপ্ত: ডিসেম্বর মাসে পাটনায় জাতীয় ব্রিজ প্রতি-যোগিতার আয়োজন হচ্ছে। তারই প্রস্তুতি-কল্পে বিহারের ব্রিজ দলের খেলোয়াড় নির্বা-চনের জন্যে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে কয়েকটি কনট্রাক্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতার আয়ো-জন করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে সিঙ্গলি-কেট ব্রিজ,পেয়ার্স কনটেস্ট ও টিম অফ ফোর অথবা ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতা। তারই একটি হলো স্থানীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্লাবের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত আই ডি সিং মেমোরিয়াল ওপেন মাস্টার পেয়ার ব্রিজ প্রতিযোগিতা।

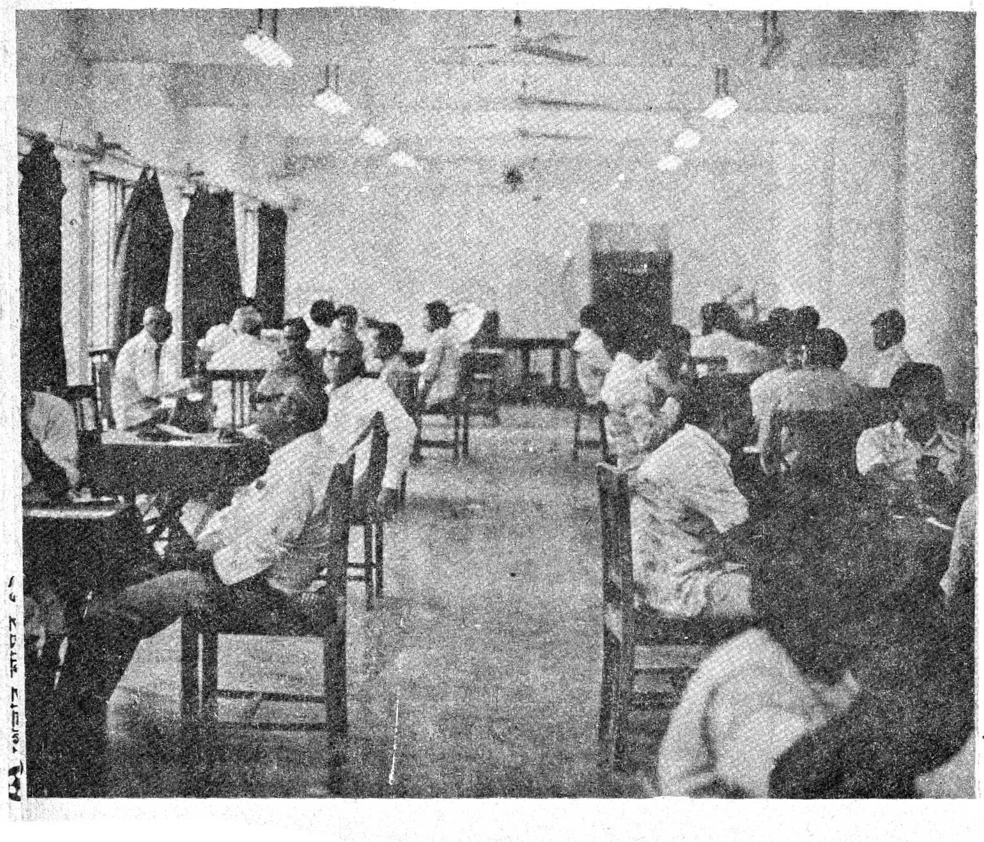
গত ২ ও ৩ জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরাট ভবনের একাংশে একটি প্রশস্ত হলে আই ডি সিং মেমোরিয়াল পেয়ার্স প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, তাপ মান ৪৪ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি, সামনেই খোলা মাঠ, পাটনার বিখ্যাত গান্ধী ময়দান। মাথা ঠাণ্ডা করে মনোসংযোগ করে খেলা এক দুরূহ ব্যাপার।

এবারের প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে ১৯টি পেয়ার টিম অংশগ্রহণ করে। দু-ভাগে ভাগ করে সব মিলিয়ে ৭২ ডিল খেলা হলো। প্রথম ৩৬ ডিল মিচেল পদ্ধতিতে এবং বাকি ৩৬ ডিল হাওয়েল প্রণালীতে। খেলা নিঃসন্দেহে খুব জমজমাট হয়েছে। একটি মাত্র হাত গ্র্যাণ্ড স্ল্যামের উপযুক্ত ছিল এবং প্রথম সারির সকল পেয়ার দলই এই হাতটি হয় সাতটি হরতনে (হার্ট) অথবা সাতটি নো ট্রাম্পে খেলে ফেলে। তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরো তীব্র এবং জোরদার হয়ে ওঠে

খেলা শেষে পয়েণ্ট জুড়তে বেশ বেগ পেতে হয়। অবশেষে ৩২৩ ভিক্টরি পয়েণ্ট সংগ্রহ করে এস এন ঝা এবং কে এম ওঝা'র পেয়ার প্রথম স্থান পেয়ে আই ডি সিং মেমো-রিয়াল ট্রফি জিতে নেন। বলতে গেলে এক রকম নিখুঁত খেলেছেন ঝা ও ওঝা জুটি। সামান্য পেছনে থেকে এবং ৩১৯ ভিক্টরি পয়েণ্ট পেয়ে এ কে শরণ ও গৌতম রায়ের জুটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

এই পর্যায়ের পরবর্তী খেলা আগামী মাস নাগাদ নিউ পাটনা ক্লাবে আয়োজিত হবে—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ব্রিজ প্রতিযোগিতা। এখানে জনান্তিকে বলে রাখি পাটনার ব্রিজের গুরু হলেন এই সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং প্রায় ৭৭ বছর বয়সেও এখনো চুটিয়ে তাস খেলে যাচ্ছেন ইনি।

আই ডি সিং মেমোরিয়াল ওপেন মাস্টার পেয়ার ব্রিজ / শ্যামল শিকদার



পশ্চিমবঙ্গ ওপেন পেয়ার কনট্রাক্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখিতে সদ্য শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ওপেন পেয়ার কনট্রাক্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গ ব্রিজ সংস্থার অনুমোদন ক্রমে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল স্থানীয় প্রগতি সংঘ। ৩৬ পেয়ার প্রতিযোগীর অংশ-গ্রহণে এবারের প্রতিযোগিতা জমজমাট হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে ছিলেন কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার প্রতিযোগী।

এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের জুটিরা অধিক সাফল্য দেখিয়ে-ছেন। কনট্রাক্ট ব্রিজ নর্থ-সাউথ জুটির খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পুরুলিয়া জেলা ব্রিজ সংস্থার শম্ভু মুখার্জি ও মানিকলাল মুখার্জি। দ্বিতীয় হন বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার কর্মকার ও বসু জুটি। তৃতীয় স্থান পান পুরুলিয়ার এস বিশ্বাস ও অনিলকুমার সামন্ত। ইস্ট-ওয়েস্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান বার্ন-পুরের দখলে থাকলেও অপর দুটি স্থান পেয়েছেন মেদিনীপুরের জুটিরা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে নগদ চারশ, দু'শ ষাট ও একশ' পঞ্চাশ টাকা।

এই প্রতিযোগিতা স্থানীয় মহলে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। উদ্যোক্তা প্রগতি সংঘ সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে রাজ্য ব্রিজ সংস্থার প্রশংসা কুড়োয়।

★

সম্প্রতি আদ্রা সেরসা স্টেডিয়ামে চারদিন-ব্যাপী আন্তঃসাবসেণ্টার রেলওয়ে ব্রিজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডুপলিকেট, ওপন মাস্টার ও সিংগলি কেট কনট্রাক্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগে আদ্রা এঞ্জি-নিয়ারিং কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তারাই হয়েছে চ্যাম্পিয়ন। এই বিভাগে প্রতিটি খেলোয়াড়ই ছিলেন আদ্রা এঞ্জিনিয়ারিং ক্লাবের সদস্য।

মেখলিগঞ্জে ফুটবল

কুচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ শহরে বীরেন্দ্র স্মৃতি ফুটবল লিগ জুন মাসের ১০ তারিখে শুরু হয়েছে। টাউন মাঠে এই লিগের পরিচালনা করছে নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাব।

শব্দ জব্দ

নীলোত্তম মুখার্জি
চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল,
পোঃ + জেলা—পুরুলিয়া।

পাশাপাশি

১। কলকাতায় অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেটে সফরকারী ভিন্‌দেশী দলগুলির মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এই খেলোয়াড়ের সংগ্রহের সীমা কেউ ছাড়াতে পারেনি।

২। ১৯৭৮—ইস্টবেঙ্গলের বরদলুই ট্রফি জয়ের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এই খেলোয়াড়।

৩। জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী ভারতীয় দৌড়বীর, পরবর্তীকালে অবহেলা ও অনাদরে বোন ক্যান্সারে মারা যান।

৪। সদ্য অনুষ্ঠিত এশিয়ান ট্র্যাক ও ফিল্ড কম্পিটিশনে ১৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা গলায় ঝুলিয়েছেন এই ভারতীয় অ্যাথলিট।

৫। বাংলার এই অ্যাথলিট এশিয়ান ট্র্যাক ও ফিল্ড মিটে ভারতের জামা গায়ে রিলে রেসে একটি ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ভারত তৃতীয় স্থান পাওয়ায়।

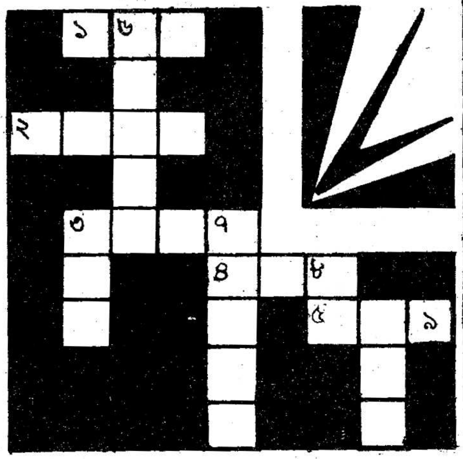
৩। ভারত ও পাকিস্তানের যুব ক্রিকেট দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত 'মিনি টেস্টে' পাকিস্তান দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়।

৬। এই ছিপছিপে চেহারার পাঞ্জাবী ফুটবলার ৭৭ সালে কাবুলে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন।

৭। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন বুশ দাবাড়ু কারপোভকে গত বছর খেতাব ধরে রাখতে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন এই খেলোয়াড়।

৮। ইংল্যাণ্ডের এই বিশ্বখ্যাত উইকেটকিপার ৮৯টি টেস্টে ২৩৩টি ক্যাচ ধরেছেন।

৯। গত বছর আই এফ এ শিল্ডে মোহনবাগানের ফায়ারিং স্কোয়াডের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র।



শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা

শব্দ-জব্দ'র সমস্যা সৃষ্টি ও তার প্রতিকারের দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদের। তবে আমাদের ইচ্ছা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই তা সীমিত থাক। তাঁরা যেন সমস্যা ও সমাধান একই সঙ্গে আমাদের কাছে পাঠান। যাদের পাঠান শব্দ-জব্দ ছাপা হবে তাঁরা পুরস্কার স্বরূপ পঁচিশ টাকা পাবেন। তবে নিজ নিজ স্কুলের প্রধানের সার্টিফিকেটসহ শব্দ-জব্দ পাঠান আবশ্যিক। সঙ্গে পুরো নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের নাম লিখতে ভুলবেন না।

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান।

নাম ——————

অভিভাবকের নাম ——————

ঠিকানা ——————

বিদ্যালয় ——————

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ——————

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ——————

শব্দ-জব্দের উত্তর (২৬ জানুয়ারি)

পাশাপাশি

১। অলোক ২। কেম্পেস ৩। বিভাস ৪। নিমাই ৫। অধীপ।

উপর-নীচ

১। অমিত ৬। সমর ৭। সুভাষ ৮। বার্তোনি ৯। প্রদীপ।

(কেউ সঠিক উত্তর পাঠাননি)

প্রশ্ন ও উত্তর

১। একটি টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট দখল করেছিলেন কে? কোথায় কোন্ টেস্টে এই রেকর্ড করেছিলেন?

২। টেস্ট ক্রিকেটের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে রেকর্ড সংখ্যক রান (৪৫১) করেছিলেন ডব্লু এইচ পন্সফোর্ড ও ডি জি ব্র্যাডম্যান। ব্যক্তিগতভাবে কে কত রান পেয়েছিলেন?

৩। ১৯৭০ বিশ্বকাপ ফুটবলে জয়ী ব্রাজিলের অন্যতম ধারালো অস্ত্র এই ফুটবলারের বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার কিছুদিন আগে চোখে গুরুতর অপারেশন হলেও বিশ্বকাপ জয়ী দলে তার বাঁধা জায়গা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

৪। বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তী এই খেলোয়াড় ১৯৭৪ বিশ্বকাপে দর্শক হিসেবে খেলা দেখলেও প্রতিদিন সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে থাকতেন সংবাদ-শিরোনামে।

৫। ত্রিশের দশকে ইতালির এই প্রাচীন পন্থী সমর্থ ও সাহসী রাইট হাফ কখনো-সখনো সেণ্টার হাফে অ্যাটাকিং ফুটবল খেলতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে দারুণ উচ্ছৃংখল ছিলেন।

—সংগ্রাহক

প্রশ্ন ও উত্তর (২৬ জানুয়ারি)

১। লাবুনা অ্যাঞ্জেল। লাবুনার জন্ম এখন থেকে ৬১ বছর আগে।

২। লিওনিডাস-ডি-সিলভা।

৩। উইলফ্রেড রোডস। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়কত্ব করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কিংসটন টেস্টে ৫২ বছর ১৬৫ দিন বয়সে।

৪। ২৮৭ মিনিটে ১৯৩২-৩৩ সিরিজে অকল্যাণ্ড টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের ওয়ালিহ্যামণ্ড ত্রি-শতাধিক রানের ইনিংস খেলেন।

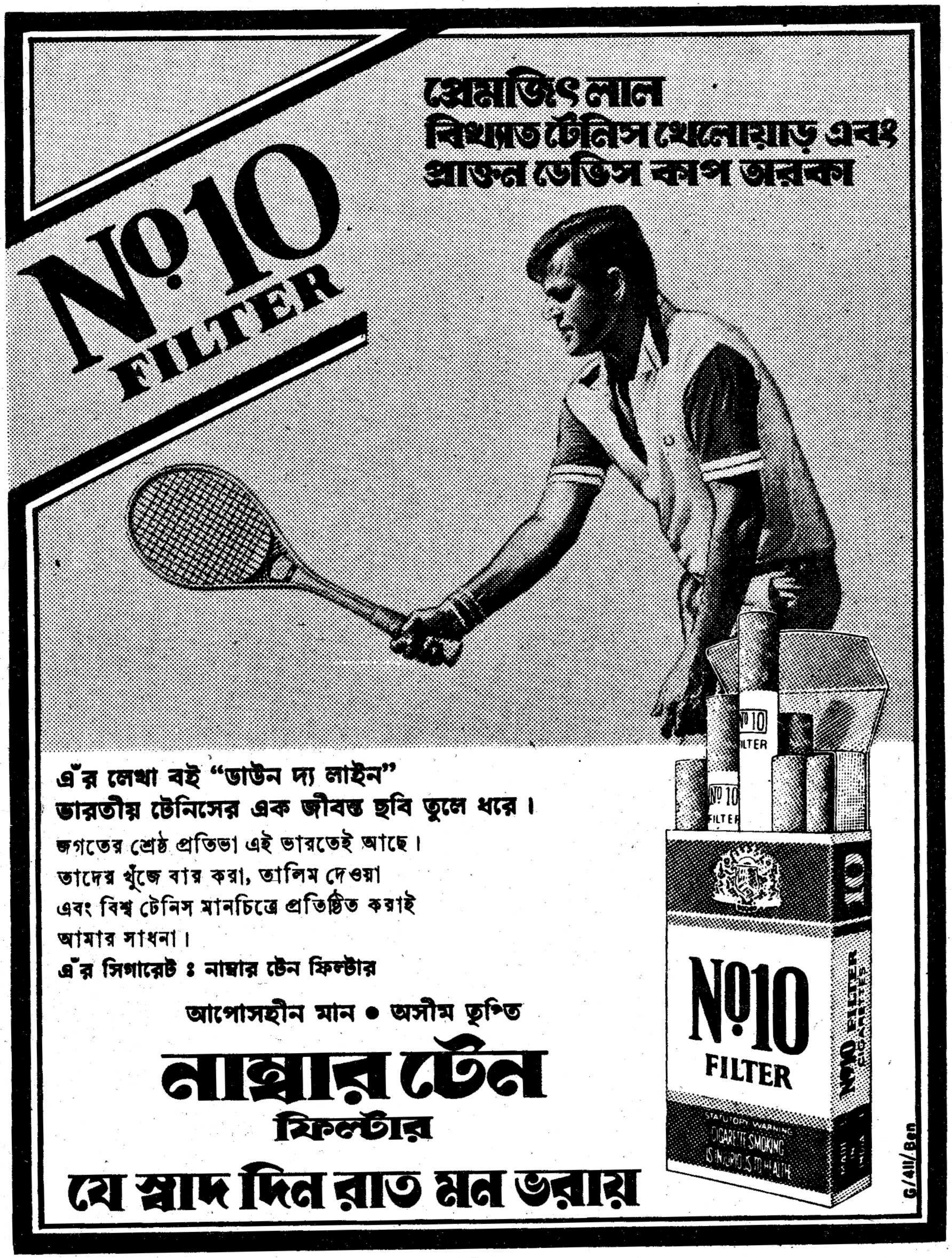
৫। ১৫১ রান। নিউজিল্যাণ্ডের বি এফ হেস্টিংস (১১০) এবং আর ও কলিঞ্জ (৬৮-অপরাজিত) অকল্যাণ্ড টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সিরিজে এই রান করেন।

নিয়ম কানুন

এখন থেকে 'খেলার আসর'-এর এক বছরের গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৫ টাকা। ছয় মাসের জন্য ৩৫ টাকা। রেজেস্ট্রি ডাকে পেতে হলে অতিরিক্ত যথাক্রমে ৪০ টাকা ও ২০ টাকা দিতে হবে। গ্রাহকরা বিশেষ সংখ্যা বিনামূল্যে পাবেন। গ্রাহক-চাঁদা মনি-অর্ডার বা ব্যাঙ্ক-ড্রাফট করে পাঠাতে পারেন। পাঠাবেন আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান Eastern Horizon, ৭ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩ ঠিকানায়।

মনে রাখবেন চাঁদার 'নতুন হার চালু হয়েছে ৬ এপ্রিল '৭৯ সংখ্যা থেকে।

সার্কুলেশন: ৭ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন: ২৪-৮৬৮১।



বিধিসম্মত সতর্কীকরণ:
সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING:-
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

গুজব তাহলে সত্যি হলো

খবর্দার ঃ সাত জুলাই'এর ওই মহারণের ফল কি হবে তা সুনির্দিষ্ট করে জানত কার্টুনিস্ট আলি আর দু'দলের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়রা। ঠিক হল খেলা 'ড্র' হবে। কোন ঝামেলা নেই। অর্থাৎ 'গট্-আপ'। এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল শনিবারের শেষ বেলায় ময়দানের আকাশে বাতাসে।

কার্টুনিস্ট আলিকে পেলাম আকাশবানীর সামনে, খেলা দেখে ফিরছেন, লম্বা-চওড়া, সাদা-কালো ডোরাকাটা ঝকঝকে একটি সার্টগায়ে খুশী মনে মাঠ থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে সামনে দাঁড়ালাম, ছোট-খাট মানুষ আমি, একটু নীচু হয়ে চশমার ভিতর দিয়ে দেখে বললেন—'পাঁচুবাবু যে, কি খবর?' 'আচ্ছা আলিদা খেলার আসরে আপনি কার্টুন দিয়ে বলেছেন—ইস্টবেঙ্গল আগে গোল দেবে। পরে মোহনবাগান তা শোধ করে দেবে—তাই তো হোল। অত আগে থেকে আপনি জানলেন কি করে?' সময় নষ্ট না করে সরাসরি প্রশ্ন করি।

'কেন জানব না! আরে আমরা শিল্পীরা তো সত্যদ্রষ্টা।—আমরা অমন আগে থেকে জানতে পারি।' বলে এক রহস্যময় দ্রষ্টব্যের মত এক হাসি হাসলেন। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম বটতলার দিকে। ফুটবলের কোন রহস্য যেখানে অনাবিষ্কৃত থাকে না। পেয়েও গেলাম বটতলা-মজলিসে অভিজ্ঞ কয়েকজনকে। আমাকে দেখে ওদেরই মধ্যে যিনি সবচেয়ে (এই নিয়ে মোহনবাগান ঃ ইস্টবেঙ্গল খেলা ১১ বার, জাতীয় ফুটবল একবার ও বিদেশী কোন টিমের খেলা দেখছেন অন্তত আটবার) তিনি আমাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে বললেন—'আচ্ছা তুমি বল পাঁচুদা, প্রথম হাফে ইস্টবেঙ্গল ভাল খেলেছে, ঠিক আছে। সাবির গোলের সুযোগ মিস করেছে তাও ঠিক, কিন্তু সাবির মোহনবাগানের ব্যাকের ভূমিকা নিয়ে গোল লাইন থেকে একটা বল টেনে আনল এটা কেমন কথা! তারপর দেখ—মোহনবাগানের গোল। মানসকে যেন চিন্ময় ডেকে এনে গোল পাইয়ে দিল। মানস ফার্স্ট হাফে এসে ভাস্করকে কি যেন বলে গেল হেসে হেসে। বিদেশকে তো দেখলাম চিন্ময়ের পিছন পিছন ঘুরতে। আবার দেখ—মাঝ মাঠ থেকে প্রসূন, গৌতম সব সট নিচ্ছে, কেন রে বাবা, এগোতে হয়? তুমি তো জান না প্রতাপ বার বার কাছে বসা ফটোগ্রাফারদের জিজ্ঞাসা করছিল খেলা শেষ হতে বাকি কত? এমন আরও কত বলা যায়। তুমি জিজ্ঞেস কর সবাইকে, আমি যা বললাম ঠিক কিনা।' আমি জিজ্ঞেস করব কি, কাকেই বা করব?

বটতলা জুড়ে এক কথা, অভিজ্ঞ বট-গাছটিও তাতে সায় দিল। অগত্যা ছুটলাম ফিরে মোহনবাগান তাঁবুর দিকে। যদি কাউকে পাওয়া যায়। কিন্তু পি কে নেই, অধিনায়ক দিলীপ পালিত নেই। ফিরে এসে একটু রাতে পাকড়াও করলাম দিলীপ পালিতকে, বললাম; 'বটবৃক্ষ যাতে সায় দিয়েছে তুমি তাকে অস্বীকার করতে পার?' একেবারে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায়।

দিলীপ ইস্টবেঙ্গলের চাপের পরেই এই আক্রমণের মুখোমুখি হয়েও হেসে ফেলে বলল—'কি ব্যাপার বলুনতো? এমন একটা উদ্ভট কল্পনা মাথায় এলো কি করে?'

'না সবাই বলছে তো?'

'আচ্ছা পাঁচুদা-সবাই বলছে বলে আপনার মত লোকও বলবে?'

এরপরে আর কোন কথা বলা যায়? ওর মতে আমি যখন 'তেমন লোক'। টেলিফোন করলাম পি কে-র বাড়ি। বাড়ি নেই। তিনি সেই মুহূর্তে সাংবাদিক।

ধরলাম ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক প্রশান্তকে। ও ক্ষেপে গেল, 'আচ্ছা পাঁচুদা তুমি কি? হাতে পেয়ে এত বড় ম্যাচটা জিততে পারলাম না। বাড়ি বসে নিজের, পরের যার হাত পাচ্ছি তাই কামড়াচ্ছি। আর তুমি বলছ ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছি? মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল কেউ কাউকে পেলে কোনদিন ছাড়ে? খুব খারাপ লাগছে—মন খুব খারাপ, জান তো?'





দুই প্রধানের পতাকা একই সূত্র ও আবেদনে গ্রথিত—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে শনিবার সকালে।

সাত তারিখের সকাল, সেই বটতলার ছায়ায়/পাহাড়ী



গুজব, নিছক গুজব

লিগের ভীষণ লড়াই যতই এগিয়ে আসছিল, উত্তেজনা ততই মাত্রাছাড়া হচ্ছিল। কিন্তু শনিবারের দ্বৈরথ-এর তিন-চার দিন আগে থেকে রাজ্যের সরকার, প্রশাসন, পুলিশ সব্বাই যেমনি একটু নড়াচড়া শুরু করলো (এবং তা বেশ 'সিরিয়সলি'!) অমনি ম্যাচের ফল নিয়ে একটা ফল্গুধারা কথাবার্তা প্রায় সর্বত্র আলোচিত হতে লাগল। অর্থাৎ যতই হৈ হৈ ইস্টবেঙ্গল অথবা মোহনবাগানের জোরালো সমর্থকরা করুক, যত বিরাট ব্যবধানে জয়ের স্বপ্নবিলাসে ওরা বিভোর থাকুক, ম্যাচ ড্র হচ্ছে। এই ড্র করার জন্যে নাকি মন্ত্রী মশাইদেরও কেউ কেউ দুই ক্লাবের কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে বোঝানো শুরু করেছে। জয়-পরাজয়ের পরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি কেউ নাকি নিতে চাইছে না, বিশেষ করে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিদেশে। এটাই গুজব।

এই গুজবই ম্যাচের আগে ডালপালা বিস্তার করে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। সকালে বাজারের পথে একজন বললেন, নাঃ মাঠে যাচ্ছি না। শুধু শুধু ওই ধকল আর সইব কেন। ম্যাচ যখন ড্র হচ্ছেই!

দু' একজন আরও সরেস গপ্পো বানাতে ছাড়লো না। শুক্রবার রাত বারোটা পর্যন্ত মন্ত্রী পর্যায়ে তৎপরতা চলেছে (যেন নির্বাচনের আগের রাত!) ম্যাচ ড্র হোক। ম্যাচের সকালে এক বহুল প্রচারিত দৈনিকে এক স্বনামধন্য খেলোয়াড়ের প্রতিবেদনে বেরোল, 'আজকের ম্যাচ স্থগিত হবে যদি অমীমাংসিত থাকে।' ব্যস, গুজব আরও কোমরে জোর পেল, যদিও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোচ এদিনই সাক্ষাৎকারে জয়ের আশা প্রকাশ করেন।

মাঠে গিয়ে কি দেখা গেল? ইস্টবেঙ্গল পুরো ৩২ মিনিট মোহনবাগানকে চেপে রাখল। ডিফেন্সের ভুলে গোলও পেল। অবশ্য সাবির ২টি গোল মিস করল যা মিস করা অনেক অনুশীলন করেই শিখতে হয়। সুরজিতের সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, আর একদিকে ডেভিডের ২টি তীব্র সট প্রতাপ অনেক কষ্টে গোল বাঁচাল। চিন্ময়ের ব্যাক পাসকে অনেকে মানসকে থ্রু পাস দেওয়া বলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্বে বিদেশের সট মুখে লেগে মিনিট দেড়েক মনোরঞ্জনের পৃথিবীটা দুলে ওঠা? (যা গোল হতে পারতো।) এত কিছুর পর কি বলা চলে, ইস্টবেঙ্গল-মোহবাগান ম্যাচ ড্র করার নির্দেশ বা অনুরোধ ছিল?

আসলে ১৯২৫ থেকে যে দ্বৈরথ চলে আসছে তা কখনোই গড়াপেটা হওয়া কী সম্ভব? কোনদিন কেউ শুনেছে কী? আসলে অন্য সবই হতে পারে তবে 'ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লড়াই (কী কলকাতায়, কী অন্যত্র) কখনো গড়াপেটা হতে পারে না। গুজব, নিছকই গুজব।

স্বভাষ দত্ত

সাত জুলাই-এর ঠিক আগে তিন প্রধানের খেলাতেই দাপট ছিল না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সাত জুলাই-এর মহারণের আগেই তিন প্রধানের এক মহমেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেল জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে। মহমেডান প্রথম ম্যাচেই ক্যালকাটা জিমখানার সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট খুইয়েছিল। রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচটিতে মহমেডান শেষ পাঁচ মিনিটে দুটি গোল পেয়ে যায় মাঠে দারুন গণ্ডগোল সত্ত্বেও রেফারির খেলা চালিয়ে যাওয়ার বেপরোয়া সিদ্ধান্তের দৌলতে। ওই সময় মাঠের একপ্রান্ত জুড়ে ছিল পুলিস এবং অন্যদিকে আক্রান্ত হয়েছিল রেলওয়ের খেলোয়াড়রা। গোল দুটো সে সময়েই হয়েছিল।

বড় লড়াই-এর আগে ইস্টবেঙ্গল হঠাৎ করে বিশ্রী অবস্থায় পড়েছিল হাওড়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ১—১ ড্র-র পর ৬৪ মিনিট পর্যন্ত আর গোল না পেয়ে। ইস্ট-বেঙ্গল খেলোয়াড়দের মধ্যে পরস্পরের বোঝা-পড়ার ঘাটতি চোখে পড়েছিল বড় বেশি। ছাব্বিশ মিনিট স্ট্রাইকার হিসেবে খেলে মনজিৎ সেদিন গোলও পেয়েছিল একটা। চোট পেয়ে ওকে বসতে হয় এবং পরিবর্তে খেলে সাজ্জাদ। মাত্র ১৮ মিনিট খেলে সাজ্জাদকেও বসতে হয় এবং অধিনায়ক প্রশান্ত নামে। মূলত ডেভিড ও সাবির ভাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল সেদিন জয় পেয়েছিল।

মোহনবাগান পরপর দুটো ম্যাচেই ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে ২—০ গোলে জিতলেও ফরোয়ার্ড লাইনের তেমন বাহাদুরী ছিলনা। বড় ম্যাচের আগের দুটি ম্যাচে এমন খেলায় তাই সমর্থকদের অনেকেই হতাশ হয়েছেন। রণজিত দুটি ম্যাচ খেলে একটি করে গোলও পেয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল-৩ হাওড়া ইউনিয়ন-১

(মনজিত ও ডেভিড-২) **(সুব্রত)**

বড় লড়াই-এর আগে শেষ ম্যাচটিতেও ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা তেমন ভালো বোঝা-পড়ার নজীর রাখতে পারেনি। সেদিন সুরজিত ও মিহির ছিলনা ফরোয়ার্ড লাইনে।

শুরুর চার মিনিট বাদেই সুভাষের দুর্দান্ত ফ্রি-কিক পোস্টে ধাক্কা খায়। তের মিনিটের সময়ে ভাস্করের গোলকিক ধরে মনজিত হাওড়া ইউনিয়নের লেফট স্টপার শঙ্কর মিত্রকে কাটিয়ে সুন্দর গোল করে। রাইট আউট সুব্রত চ্যাটার্জির সোজা গোলমুখী সটে ধেয়ে যায় কাঞ্চন। মনোরঞ্জন চকিতে ছুটে কাঞ্চনকে কভার করে এবং পায়ের ফাঁক দিয়ে বল ছেড়ে দেয় ভাস্করের উদ্দেশ্যে। ছুটে এসে বল ধরে ভল্ট দেবার ভঙ্গিমায় থেকে ভাস্কর টার্গেট মিস করে এবং ফের ঘুরে বলের পিছু ছুটলেও তা জালে চলে যায়। এরপরই মনজিত চোট পেয়ে বসে যায় এবং সাজ্জাদ নামে। পরে সাজ্জাদেরই বদলী নামে অধিনায়ক প্রশান্ত। কাজলকে এগিয়ে খেলানো হয়।

শেষ ছ' মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল আরও দুটি গোল পায় মাঝখানের ৩৯ মিনিট বিরক্তি-কর খেলায় সময় কাটিয়ে। প্রশান্তর কাছ থেকে বল পেয়ে ডেভিড আগুয়ান গোলকিপার



ইস্টবেঙ্গল : হাওড়া ইউনিয়ন

অশোককে ফাঁকি দিয়ে গোল পায়। খেলা শেষের এক মিনিট আগে সুভাষের সেন্টার পেয়ে কোণাকুণি সটে ডেভিড আরও একটি গোল করে।

মোহনবাগান-২ ইস্টার্ন রেলওয়ে-০

(পায়াস ও রণজিত)

শুরুর ৯ মিনিট বাদেই বিদেশের ব্যাক পাস ধরে পায়াস তীব্র সট নেয় এবং বল প্রথমে পোস্টে লেগে পরে গোলকিপার সুজিতের হাত ছুঁয়ে গোলে চলে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ১৪ মিনিটে প্রসুনের লব পৌছায় রণজিতের কাছে। লেফট স্টপার সরল গোলকিপারকে ব্যাক পাস করলে রণজিত ছুটে গিয়ে বল ঠেলে গোল পায়। রণজিত এদিনই এ মরশুমে প্রথম খেলল এবং গোল পেল। শ্যামের বদলী হয়ে সে মাঠে নেমেছিল দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই।

সারা খেলায় ইস্টার্ন রেল কোন হানা দিতে পারেনি মোহনবাগান রক্ষণে। তারা সবসময় কেবল মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। তাতেও কোন বিক্রম ছিল না। অথচ মোহনবাগান গোল বেশি পেল না কেবলই ডানদিক দিয়ে মানস মারফতে আক্রমণের চেষ্টার ফলেই।

মহমেডান স্পোর্টিং-২ রেলওয়ে এফ সি-০

(হাবিব ও সুজাত)

পঁয়ষট্টি মিনিট পর্যন্ত কোন গোল মহমেডান পায়নি। কারণ খেলাটায় তারা গোলের মতো সুযোগ একবারও করতে পারেনি। সানজারি একবার কেবল গোলকি-পার কিরণকে পেয়েও গোল করতে পারেনি। রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব কোনো ভালো আক্রমণ তো করেইনি, খেলাটাকে বরাবর মাঝমাঠে বেঁধে রাখায় সচেষ্ট ছিল। সুজাতকে খেলানোর ইঙ্গিত পেতেই সানজারি ছুটে গিয়ে অফিসিয়ালদের ধমকানো শুরু করে। কয়েক মিনিট বাদে আবার তাকে যখন মাঠের বাইরে আসার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন সে জার্সি খুলে ছুঁড়ে দিয়ে উদাম গায়ে মাঠ ছাড়ে।

এদিকে কোনো গোল না হওয়ায় সবুজ গ্যালারির দর্শক আসন থেকে মাঠে ইঁটের টুকরো পড়তে থাকে। খেলা শেষের পাঁচ মিনিট আগে পুলিস গণ্ডগোলের আঁচ পেয়ে বেপরোয়া লাঠি পিটিয়ে দর্শকদের মাঠের বাইরে বার করার চেষ্টা করে। পূব কোণে তখন পঁচিশ তিরিশজন পুলিস দর্শকদের ইঁট ঠেকাতে না পেরে পিছিয়ে এসে মাঠের অনেকটা জায়গা দখল করে নেয়। রেফারি মিলন দত্ত তবুও পশ্চিম দিকে খেলা চালাতে থাকেন। হঠাৎ সাইড লাইন থেকে বহুজন মাঠে ঢুকে রেফারির চোখের সামনে রেলদলের খেলোয়াড়দের মারধর শুরু করে। অলক মজুমদার ঘুঁষির ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিশোর মুখার্জির চোখে জলন্ত সিগারেট চেপে ধরা হয়। মাঠের ভেতরে তখন মহমেডানের একাধিক কর্মকর্তাসহ বহু দর্শক ঢুকে পড়েছে এবং পূবদিকে কয়েক ডজন পুলিস হয়রা থামাতে ব্যস্ত, তখনও রেফারি খেলা বন্ধ করেননি। এবং সেই অবস্থায় মহমেডান হঠাৎই গোল পেয়ে যায়।

হাবিব খানের পর লব থেকে মহম্মদ হাবিব বিনা বাধায় (একজন মাত্র রেলওয়ে খেলোয়াড় ছিল গোটা রক্ষণ এলাকায় এবং অলোক তখনও মাটিতে শুয়ে) গোল করে। দু' মিনিট বাদে হাবিব থেকে খাবাজি সেন্টার করে। খাবাজির সেন্টারে ভলি মেরে সুজাত গড়ের মাঠে প্রথম গোল পায় (২-০)। দুই গোল হয়ে যাবার পর রেফারি খেলার সাময়িক বিরতি দেবার ফুরসত পান এবং অলোককে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে কিছু হামলাকারী জর্জ টেলিগ্রাফ টেন্টের গেট খুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই সময় ক্লাবের কর্মকর্তারা তিনজনকে ধরে আটকে রাখেন এবং পরে পুলিসের হাতে সঁপে দেন। সাতজন পুলিস সহ ৩১ জন ওইদিন জখম হয়েছিলেন।

ইস্টবেঙ্গল-৫ কুমারটুলি-০

(মিহির [হ্যাটট্রিক], সাবির ও সুভাষ)

এ মরশুমে মিহিরকে নিয়ে অনেক ঝামেলা এবং কিছু অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। কারণ সে প্রথম দশটা ম্যাচে একটাও গোল পায়নি। তার মতো খাটিয়ে প্লেয়ার যে ইস্টবেঙ্গল দলে বড় প্রয়োজন— এই বোধটা ছিল সুরজিত, সুভাষ, কোচ অরুণ ঘোষ এবং কিছু কর্মকর্তারও। ভালো ফুটবলারের সময়ের ব্যর্থতায় সদস্য সমর্থকদের তিরস্কার অনেক সময় ঝামেলার সৃষ্টি করে। মিহিরের অবস্থাটাও গড়াচ্ছিল তেমনি বিশ্রী পথে। বড় দলের পক্ষে খেলতে গেলে গোল পাওয়াটাই স্ট্রাইকারের একমাত্র গুণ-বিচার হয় বেশীর ভাগ সমর্থকদের কাছে। সুরজিত ও সুভাষ তাই অনেকগুলো ম্যাচে মিহিরকে দিয়ে গোল দেওয়ার জন্য প্রয়াস চালিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল যেদিন প্রদর্শনী ম্যাচ খেললো এরিয়ানের সঙ্গে, সেদিনও প্রথমদিকে মিহির মারফতে গোল পাবার বহু কসরৎ করা হয়েছে।

সবশেষে এতসব ঝক্কির হাত থেকে মিহির রেহাই পেল কুমারটুলির বিরুদ্ধে খেলাটায় প্রথম গোল এবং সঙ্গে একটি চমৎকার হ্যাটট্রিকও পেয়ে। ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচটায় ৫-০ জয় পেল। যার বাকি দু'টি এসেছে সাবির ও সুভাষ মারফতে। এ মরশুমে প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিল সাবির রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকের গৌরব পেল মিহির।

মিহির দ্বিতীয় মিনিটেই গোল পেতে পারতো। কিন্তু সে খুব কাছ থেকেও পায়ে বলে যোগাযোগ ঘটাতে পারেনি সুভাষ এবং পরে সুরজিতের ক্রশ পাস থেকে। পরের মিনিটেই ইস্টবেঙ্গল গোল পায়। দেবরাজ কুমারটুলির লেফট ব্যাক রঘু নন্দীকে ফাঁকি দিয়ে গোলমুখে বল ফেলে। সাবির শুধু ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেয় (১—০)।

কুমারটুলির ডিফেন্স সেদিন একদম পলকা ছিল এবং তাইতেই ইস্টবেঙ্গলের একতরফা আক্রমণ ছিল বারেবারে। প্রথম গোলটার পর কুমারটুলি একবারই মাত্র সুযোগের সৃষ্টি করেছিল গোল পাবার মতো। অরুণোদয় সেন্টার করেছিল চমৎকার। গোলে শুধু একা ভাস্করকে পেয়েও শক্ত সট নিতে পারেনি।

দ্বিতীয় গোল হয় ২৮ মিনিটে। ডান দিকের আউট লাইন থেকে ফ্রি-কিক ফেলে সুভাষ ডান দিকে পোস্টের প্রায় গা ঘেঁষে। ওৎ পেতে থাকা কাজল মাথায় বল পেছনে ফেরায় পেনাল্টি স্পটের কাছে মিহিরের মাথায়। মিহির হেডে গোল পায় (২—০)।

বিরতির পর সুভাষের একদম মাপা সেন্টার থেকে মিহির তার দ্বিতীয় গোল দেয় মাথা ছুঁইয়ে (৩—০)। এরপর মিহিরকে

দিয়ে হ্যাটট্রিক করাবার নানা ঝকমারির পর সাফল্য আসে ১৫ মিনিটের সময়ে। মাঝ মাঠ থেকে মনোরঞ্জনের লব ধরে সাবির। একা সুবীরকে পেয়েও সাবির গোলে না মেরে বল ঠেলে দেয় আগুয়ান মিহিরের উদ্দেশ্যে। ডান পায়ের জোরালো সটে মিহির হ্যাটট্রিক পায় (৪—০)। পাঁচ মিনিট বাদেই মিহিরের ক্রশ পাস ধরে সুভাষ ডান পায়ের ইনস্টেপের দুর্দান্ত মারে গোল পায় (৫—০)। সুভাষ এদিন অনেক ভাল সুযোগ নষ্ট করেছে বিশ্রীভাবে বাইরে মেরে। তবে ওর গোলটা এবং মিহিরকে দেওয়া পাস সব চার বছর আগের সুভাষকে মনে করিয়ে দেয়।

মোহনবাগান-২ ঃ টালিগঞ্জ অগ্রগামী-০

(মানস ও রণজিত)

ছাব্বিশ মিনিট মাত্র মোহনবাগান ভাল খেলার চেষ্টা করেছে সুন্দর দেওয়া নেওয়ায়। দুই স্ট্রাইকার শ্যাম ও তপন পাওয়া সুযোগ-গুলো কাজে লাগাতে পারলে ওই সময়েই আরো গোল হতো। একুশ মিনিট বাদে তপনের বদলী নামে রণজিত। ২৭ মিনিটে বিদেশের সেণ্টার পৌঁছয় গোলমুখে। শ্যাম ও রণজিত যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পোস্টের ধার ঘেঁষে অপেক্ষায় ছিল। প্রথমে আলতো করে মাথা ঠেকিয়ে বল দেয় রণজিতকে। গোলকিপার গৌতম ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তেই রণজিত নিজে সট না নিয়ে বল ঠেলে দেয় আগুয়ান মানসের উদ্দেশ্যে। মানস ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেয়।

এরপরেই খেলাটা হয়ে যায় মন্থরগতির। দু'পক্ষই একে অপরকে ঘায়েল করার বাজে চেষ্টায় সময় কাটায়। টালিগঞ্জ একবারও গুছিয়ে কোন আক্রমণ করার চেষ্টা করেনি। শ্যামল একবার ওভার ল্যাপ করে এগুতে থাকলে টালিগঞ্জ লেফট ব্যাক অরুণদেব অবৈধভাবে বাধা দেয়। রেফারি সুমন্ত ঘোষ অরুণদেবকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

মাঠের চারদিক থেকে ইঁট-পাথর বর্ষিত হয়। মাঝে মাঝে খেলাও বন্ধ করতে হয় রেফারিকে টালিগঞ্জ খেলোয়াড়দের আবেদনের পর।

মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল হয় সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে। ফ্রি-কিক থেকে বিদেশ বল পাঠায় গোলমুখে। তাইতে মাথা ছোঁয়াতেই রণজিত গোল পায়।

খেলা শেষে সবুজ গ্যালারি থেকে দর্শক-দের ঝটপট মাঠের বাইরে বার করতে পুলিসকে লাঠি চালাতে হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং—০ জর্জ টেলিগ্রাফ-০

দুই দলের গোলকিপার নাসির ও বিশ্বজিত্ এতো ভালো না খেললে যে কোনো দলের পক্ষেই পুরো পয়েণ্ট জুটে যেতে পারতো। গোড়ার কুড়ি মিনিট মহমেডানের দাপট কিছুটা থাকলেও পরে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে দু' পক্ষই মেতে ওঠে। বৃষ্টিভেজা মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরমে ওঠে এবং খেলার গতিও হয় প্রচণ্ড দ্রুত। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই-এর এই ম্যাচটাই এ মরশুমের সেরা—এখন পর্যন্ত বলা যায়। প্রতি অর্ধে একটি করে ডেনিসের তীব্র সট নাসির ধরে অদ্ভুত ভালো। মহমেডানের ফিলিপের লম্বা সটও খেলার গোড়ার দিকে বিশ্বজিত ধরে অত্যন্ত তৎপরতার দ্বারা। লতিফের কাছ থেকে ভালো পাস পেয়েও সুভাষ বাইরে মেরে মহমেডানের শেষ সুযোগ হারায়।

খেলা শেষে একশ্রেণীর দর্শক জর্জ টেলিগ্রাফ টেণ্টে ইঁট-পাথর ছুঁড়ে হামলা এবং ভাঙচুর করে। পুলিসকে ওইদিনই প্রথম এ মরশুমে টিয়ার গ্যাস ফাটিয়ে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে হয়।

ইস্টবেঙ্গল—৪ ঃ এরিয়ান-১

(সাবির-২, কাজল ও সমীরণ (আত্মঘাতী)) (দেবাশিস)

প্রদর্শনী ম্যাচে এরিয়ান গোলকিপার লক্ষ্মণ বেলেলের বিক্রম না থাকলে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ নয়, বেশি ব্যবধানেই জিততে পারতো। নামী-দামীদের নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এ মরশুমে দশটা ম্যাচের মধ্যে এইটাতেই তাদের-শক্তির দাপট কিছুটা দেখায়। এটা হতে পেরেছিল আচমকা এরিয়ানের দেওয়া একটা গোল হজমে এবং প্রথম পঁয়ত্রিশ মিনিট কোন গোল না পেয়ে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতে মিহিরের বদলী ডেভিডকে নামাতেই খেলাটার গতি হয়ে যায় সম্পূর্ণ ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে। তাছাড়া সমীরণের দ্বারা আত্মঘাতী গোলও এরিয়ানের মনোবল ভেঙ্গে নড়বড়ে করে দেয়।

সুভাষকে স্ট্রাইকার খেলিয়ে ডেভিডকে দেওয়া হয় লেফট আউটের জায়গাটি। ডেভিড দাপটে খেলেছে এবং ভাল মাপা সব সেণ্টার গুলি ফেলেছিল পেনাল্টি বক্সের ভেতরে। ওইগুলির দু'টি থেকে ইস্টবেঙ্গল গোল পায়।

মোহনবাগান : টালিগঞ্জ, খেলা শেষে গ্যালারি থেকে দর্শকদের মাঠের বাইরে বার করতে পুলিস ——





মোহনবাগান : রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব

সারা খেলাটায় ডিপ ডিফেন্সে ইস্টবেঙ্গলের শক্ত বাঁধন থাকলেও প্রথমার্ধে তারা গোল পায়নি মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের দৌরাত্ম্যে ঘাটতি থাকায়। তবুও দেবরাজ দারুণ সহযোগিতা করেছে ফরোয়ার্ডদের নিজেই খেটেখুটে বল জুগিয়ে। হাতে ব্যাণ্ডেজ নিয়েও কাজল চ্যাটার্জি এ মরশুমে প্রথম খেলে নির্ভরতা দিয়েছে। ওর প্রায় ৩০ গজের দুর্দান্ত সটের গোলটি দেখার মতো এবং দিনের সেরা তো বটেই।

নীচের দিকে জাঁকিয়ে খেলা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল প্রথমার্ধে গোল পায়নি কেবলমাত্র ডানদিক দিয়ে সুরজিত ও মিহির মারফতে আক্রমণ রচনার ফলেই। মিহিরের মতো গুণী প্লেয়ারকে দিয়ে এ মরশুমে গোল পাবার চেষ্টা এদিন পণ্ডশ্রম হয়েছে কেবল। ওই সময়টায় যাকে দিয়ে খেলালে গোড়াতেই সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেই সাবির কেবল এদিক ওদিক ছোটাছুটি করেছে অন্যদের কাছ থেকে বল না পাবার ফলেই। অথচ দুবার মিহির গোলে সট নেবার মতো ভাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু সফল হয়নি। চিন্ময়ের সেণ্টার (৩ মিনিট) ধরে সাবির ঠেলে দেয় মিহিরকে। পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকে মিহির সট নেয় এবং লক্ষ্মণ তা ধরে ফেলে চকিতের ডাইভে। চার মিনিট বাদেই সুরজিতের সেণ্টার পেয়ে মিহির নীচু হয়ে হেড দেয় প্রথম পোস্টের ধার ঘেঁষে এবং তা থেকে বল ফেরে লক্ষ্মণের পায়ে ধাক্কা লেগে।

সতের মিনিটের সময়ে এরিয়ানই দুম করে গোল করে বসে। দেবরাজ ব্যাক পাস দেয় চিন্ময়কে। চিন্ময় হেডে বল ক্লিয়ার না করলেও পায়ে সট নেবারও যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। কিন্তু সে বল সাইড লাইনের দিকে টানবার চেষ্টা করতেই আগুয়ান দেবাশিষ পৌঁছে যায় ওর কাছে। ভাস্করকে ব্যাক পাস এবং বল বের করে নেওয়া, এই রকম দোনামনা অবস্থায় চিন্ময়ের কাছ থেকে বল কেড়ে নেয় দেবাশিস। এগিয়ে আসা ভাস্করকে লক্ষ্য রেখে ডান পায়ের অদ্ভুত ভাল সটে দেবাশিস গোল পায় (১-০)।

এক গোলে এগিয়ে থেকে এরিয়ান মাঝে মাঝে ফুঁসে ওঠার চেষ্টা করে।

বিরতির দু'মিনিট আগে সুরজিতের ক্রশ পাস ধরে সাবির শক্ত সট নেয়, কিন্তু তাও লক্ষ্মণ ধরে ফেলে।

দ্বিতীয়ার্ধে ডেভিড নামতেই ইস্টবেঙ্গল গোল শোধ করে। প্রথম মিনিটেই ডেভিড অদ্ভুত ভাল সেণ্টার ফেলে ডানদিকে ঠিক সুরজিতের কাছে। সুরজিত এগিয়ে আসা বিশ্বজিতকে ডাইনে রেখে বল ঠেলে দেয় বক্সের মাঝে সাবিরকে। সমীরণকে সামনে পেয়েও সাবির দ্বিতীয় পোস্টে লক্ষ্য রেখে বল মারে লক্ষ্মণকে প্রথম পোস্টে রেখে (১-১)।

সুরজিত ফাঁক দেয় বিশ্বজিতকে খুব সহজেই। তার সট সমীরণ আটকাবার চেষ্টা করতেই পায়ে লেগে গোলে যায় লক্ষ্মণকে অবাক করে (২-১)। সুরজিতের ফ্ল্যাগ কিক পেয়ে সাবির পেছনে ঠেলে আগুয়ান কাজলের উদ্দেশ্যে। কাজলের লম্বা সটে ইস্টবেঙ্গল তৃতীয় (৩-১) গোল পায়।

শেষ বাঁশি বাজার তিন মিনিট আগে ডেভিডের আরও একটি মাপা সেণ্টার পেয়ে সাবির হেডে গোল দেয় (৪-১)।

মোহনবাগান-৫ খিদিরপুর-১

(বিদেশ-২, শ্যাম, প্রসূন ও মানস) (অমিত)

এ মরশুমে মোহনবাগান অনুরাগীদের প্রথম কষ্ট দিল খিদিরপুরের স্ট্রাইকার অমিত বাগচী। নটি ম্যাচে মোহন-বাগান সেদিনই প্রথম গোল হজম করল। গোলের পরে পরেই তারা ফুঁসে উঠল এবং পাঁচটা গোল করল যার দুটিই এসেছে বিদেশ মারফতে।

পরিচ্ছন্ন খেলেছে খিদিরপুর। তাদের অদ্ভুত ভাল বোঝাপড়া এবং জমিতে রেখে খেলা তাক লাগিয়েছে। মোহনবাগানের ক্রমাগত আক্রমণের মুখেও খিদিরপুরের ডিফেণ্ডাররা গোলমুখে জড়ো হয়ে জটলা সৃষ্টি করেনি। ঠিক ঠিক জায়গামত ধীর বুদ্ধি প্রয়োগে হানা-দারদের পরাক্রম সব বরবাদ করতে সবসময় সতর্ক ছিল শ্যাম, দীপঙ্কর, অশোকলাল ও দেবদ্যুতি। ফলে মোহনবাগানের স্ট্রাইকাররা শ্যাম ও পায়াস এবং পরে নয় মিনিট খেলে তপন একদম অকেজো হয়ে পড়েছিল।

শুধু কেবল আক্রমণ রুখেই না, এতগুলো গোল খেয়েও মাঝে মাঝেই খিদিরপুরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে আক্রমণের প্রয়াস গঠনমূলক



মোহনবাগান : টালিগঞ্জ অগ্রগামী

ফুটবলের নজীর রেখেছে। খেলাটায় তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও জবর ছিল।

প্রতিপক্ষ যাচাই-এ প্রথম কুড়ি মিনিট অবহেলায় কালক্ষেপ করেছে মোহনবাগান। মাঝ মাঠের খেলোয়াড়দের সাহায্য ছাড়াই ফরোয়ার্ডরা আক্রমণের চেষ্টা করেছে এবং ওই সময় প্রতিবারই বাধা পেয়েছে।

থেকে থেকে মোহনবাগান গোলের দিকে খিদিরপুর বেশ কয়েকবার ধাবিত হয়। কুড়ি মিনিটের সময়ে মাঝমাঠ থেকে বল ঠেলে দেয় উত্তম সাইড লাইনের ধার ঘেঁষে দাঁড়ান সোমনাথকে। সে বল পায়ে ধেয়ে গেলে শ্যামল ট্যাকল করার মুহূর্তেই ব্যাকপাস করে পিন্টুকে। চকিতে জায়গা দেখে পিন্টু উঁচু সেন্টার করে অমিতের মাথায়। প্রতাপকে কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়ে অমিতের মাথা থেকে ছুটে বল জালে জড়ায়।

মোহনবাগান প্রথম গোল পায় মুখ্যত গৌতমের চেষ্টায় আরও দশ মিনিট বাদে। মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে এবং পায়ে রেখে দেখেশুনে গৌতম বল দেয় গোললাইনের প্রায় কাছে অপেক্ষমান পায়াসকে। পায়াসের সেন্টার শুধুমাত্র ইনস্টেপে ঠেকিয়েই গোল পায় বিদেশ (১-১)। বিরতির এক মিনিট আগে প্রসূনের প্রায় ৩৫ গজের সট দীপঙ্করের উরুতে লেগে বাঁক নিয়ে গোলে ঢোকে (২-১)।

বিরতির পর চতুর্থ মিনিটে গৌতমের ফ্ল্যাগ কিক গোলকিপার দিলীপের হাতে লেগে পড়ে যায়। সামনে দাঁড়ান পায়াস তাতে ছোঁয়া লাগাতে পারেনি। বিদেশ ছুটে এসে বল গোলে পাঠায় (৩-১)। পঁচিশ মিনিটের সময়ে বিদেশ মাঝমাঠ থেকে দুরন্ত গতির সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে তিনজনকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে পেনাল্টি বক্সে। বিদেশের ব্যাক সেন্টার শ্যাম শুধু ফাঁকা গোলে ঠেলে দেয় (৪-১)। শেষ বাঁশি বাজার দু' মিনিট আগে বিদেশের সেন্টার থেকে মানস গোল পায় (৫-১)।

মহমেডান স্পোর্টিং-১ (সমরেশ) ভ্রাতৃ সংঘ-০

সমরেশ ও অমল রাজের মাঝ মাঠে সর্বদা বিক্রমের ফলেই মহমেডান গোল করার মত বহু সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ফরোয়ার্ডরা পাওয়া সুযোগ একবারও কাজে লাগাতে পারেনি। অথচ প্রতিপক্ষ ভ্রাতৃ সংঘের শক্তিতে ঘাটতি ছিল ওইদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। একমাত্র গোলটি এসেছে সমরেশেরই পা থেকে।

ভ্রাতৃ সংঘের দুর্ভাগ্য তারা গোল শোধ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধ-শুরুর পাঁচ মিনিট বাদেই মস্ত একটি সুযোগ তাদের ফসকে যায়। সুদীপ্ত হঠাৎই গোলমুখে বল পেয়ে ভাল একটা জোরালো-সট নেয়। কিন্তু তা ক্রসপিসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে পেনাল্টি বক্সেরই মধ্যে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা রতীন হেড দিয়ে বাইরে পাঠায় বারের উপর দিয়ে।

ভ্রাতৃর রক্ষণে দুর্বলতার হদিশ পেয়েছিল মহমেডান শুরুর অল্প কিছু পরেই। হাবিব এবং নাজীব বারবার গোলমুখে বল পায়ে হাজির হলেও গোলে সট নিতে পারেনি। সুভাষ এই নিয়ে তিনটি ম্যাচ খেললো। ওর মারফতে বেশ কিছু ভাল সেন্টার স্ট্রাইকাররা পেয়েছিল ঠিক জায়গা মতো। নাজিবের বিকল্প খেলে সানজারি তেমন কিছু করতে পারেনি। গোলে সট নিতে গড়িমসির জন্য বেশ কয়েকবার সে দর্শক হাসিয়েছে। তবে সানজারির একটা অদ্ভুত মাপা সেন্টার বিরতির এক মিনিট আগে সুভাষ পেয়েছিল। চকিতে ডান পায়ের জোরালো ভলি সুভাষ হাঁকিয়েছিল, কিন্তু তা বারের অল্প উপর দিয়ে উড়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় আমেদকে একা গোলে পেয়েও মহমেডানের তিন ফরোয়ার্ড গোলে সট নিতে ইতস্তত করায় গোল হয়নি। বক্সের ঠিক মাঝখান থেকে লতিফ বল পাস দেয় বাঁদিকে দাঁড়ানো সানজারিকে। ডাইনে দাঁড়ানো হাবিবকে আবার বল ঠেলে সানজারি। হাবিব বল পোস্টের পাশ দিয়ে বাইরে মারে। ওই সময় তিন ফরোয়ার্ডই গোল লাইন থেকে মাত্র দশ গজ দূরে ছিল। লতিফ বা সানজারি যে কেউই গোলে আগেভাগে সট নিতে পারতো। শেষ মিনিটেও মহমেডানের গোল করার মতো সুযোগ হয়েছিল। বাদ সেধেছে ভ্রাতৃর রাইট ব্যাক দেবশঙ্কর। সানজারির সেন্টার পেয়ে লতিফ সুন্দর সট নেয়। কিন্তু গোল লাইন থেকে বল ফেরায় দেবশঙ্কর।

মহমেডান একটা মাত্র গোল পেয়েছিল ষোল মিনিট বাদেই। সুভাষ সেন্টার করে-ছিল। পেনাল্টি বক্সের ভেতরে হাবিব ও নাজিবকে যুগপৎ বাধা দিতে এগিয়ে আসে গোলকিপার আহমেদ হোসেন ও দেবশঙ্কর। জটলার মধ্যে থেকে দেবশঙ্কর বল ক্লিয়ার করে। কিন্তু আনমার্কড সমরেশ লম্বা সট নিলে গোল হয়।

২৬ জুন: মহমেডান স্পোর্টিং-১ (নাজিব) সালকিয়া ফ্রেন্ডস-০

কলকাতা ফুটবলের আর এক নাম 'গটআপ'

স্টাফ রিপোর্টার: গতবার মোহনবাগান মাঠে লিগের একটি খেলা। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল ক এবং খ। হাফ টাইম হয়ে গেছে। খ এক গোলে এগিয়ে। বিরতির সময় আমি যখন বাথরুম গেছি, দেখলাম ক দলের এক ব্যাকও সেখানে। প্রথমার্ধের খেলাতেই আঁচ পেতে কারোরই কোন অসুবিধা হয়নি। ওকে জিজ্ঞেস করলাম—ম্যাচের রেজাল্ট কি হবে? ম্লান হেসে ও বলল, জানেনই তো, ১—১। এবং তাই হল।

এবার ওই ক দল কিছুদিন আগে একটি ২—২-এর খেলা খেলল। এবং ঘটনাচক্রে সেই প্লেয়ারটির সঙ্গে সেদিনও দেখা হয়ে গেল। এবার আমাকে আর প্রশ্ন করতে হল না। তার আগেই ও বলল—গটআপ। আমি বললাম—ওই মাঠে তো আজ গ আর ঘ দলের খেলা। কালবিলম্ব না করে প্লেয়ারটি বলল, ওখানেও একই ব্যাপার।

এ বছরের লিগে চারটে করে টিমের ওঠা নামার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই প্রথমদিকে সম্ভব না হলেও সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের বাইরের সেই খেলা শুরু হয়ে গেছে এবং চলেছে অব্যাহত গতিতে, যার আর এক নাম গটআপ। গড়াপেটা। কলকাতা ফুটবলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ বাসা বেঁধেছে। স্বয়ং ঈশ্বরেরও ক্ষমতা নেই এটাকে বন্ধ করার।

কিছুদিন আগে ঙ টিমের এক ফুটবলারের সঙ্গে দেখা। টিমটি এবার এরই মধ্যে লিগ কোঠার বেশ ভালো জায়গায় পৌঁছে গেছে। সহৃদয় হয়ে তাই ওরা অবনমনের আশঙ্কাগ্রস্ত টিমকে পয়েন্ট ছাড়তে আরম্ভ করেছে। তা, দেখা হতে সেই খেলোয়াড়টিকে আমি বললাম, আচ্ছা, এতে আপনাদের অবস্থাটা কেমন হয়। বড় টিম ঘুরে আসা প্লেয়ারটি বলল—জানেন, এই ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার থাকে না। আমরা অসহায়।

সত্যিই তাই, এতে খেলোয়াড়েরা যে কি যাতনা ভোগ করে, তা খেলোয়াড়েরাই শুধু জানে। জার্সি পরে মাঠে নেমে খেলার ভান করতে যে কতটা কষ্ট হয় খেলোয়াড়দের এবং এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় খেলোয়াড় মহলই। তবু এই ছেলেখেলা চলছে এবং চলবে।

একনজরে অন্যান্য খেলার ফল

২৯ জুন		
	পোর্টট্রাস্ট-১ (প্রবীর মজুমদার)	রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব-১ (উৎপল নিয়োগী)
	উয়াড়ি—০	রাজস্থান—০
২ জুলাই		
	খিদিরপুর—১ (পিন্টু দত্ত)	ক্যালকাটা জিমখানা-০
	ইস্টার্ন রেল—০	বি এন আর—০
৩ জুলাই		
	সালকিয়া ফ্রেণ্ডস—১ (শিবব্রত নাথ)	রাজস্থান—১ (কার্তিক শেঠ)
	জর্জ টেলিগ্রাফ—৩ (বাদল ভট্টাচার্য, মুনীশ মান্না, বিভাস সরকার)	ভ্রাতৃ সংঘ—১ (বাবুল দাস)
৪ জুলাই		
	এরিয়ান—১ (দেবাশিস রায়)	পুলিস—১ (লিয়াকৎ আলি)
	কাস্টমস—০	পোর্টট্রাস্ট—০
	*কালিঘাট—০	স্পোর্টিং ইউনিয়ন—০
৫ জুলাই	খিদিরপুর—০	ইস্টার্ন রেল—০
	হাওড়া ইউনিয়ন—০	ক্যালকাটা জিমখানা—০
৬ জুলাই	ভ্রাতৃ সংঘ—১	কালিঘাট—০
	জর্জ টেলিগ্রাফ—০	স্পোর্টিং ইউনিয়ন—০
	বি এন আর—১	কুমারটুলি—১

* (এই ম্যাচটি গত ৩০ জুন নির্ধারিত সময়ের সাত মিনিট আগে বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গোলশূন্য অবস্থায়।)

বিয়র্ণ বর্গ আবার উইম্বলডন জিতলেন

১৯২২ সালে 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড' অবলোপের পর পরপর চারবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়েছে সুইডেনের ২২ বছরের খেলোয়াড় বিয়র্ণ বর্গ। প্রশান্ত মুখমণ্ডল অসম্ভব এক দৃঢ়তার দ্যুতি সবসময় প্রকাশ পায় এই 'সুইডি'র এবং অদম্য মনোবলেই সে ৭ জুলাই সিঙ্গলস ফাইনালে রসকো ট্যানরকে ৬-৭, ৬-১, ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে পরাস্ত করে ১৯৭৯ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

১৯৭৫ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্থার অ্যাশের কাছে বিদায় নেওয়ার পর বর্গ আর কখনোও উইম্বলডনে হারেনি। বিগত তিন-বার তার রানার্স জিমি কোনর্স।

ঘণ্টায় ১৪০ মাইল গতিবেগসম্পন্ন সার্ভিসের অধিকারী সাতাশ বছর বয়সী এই মার্কিন খেলোয়াড়কে হারাতে অবশ্য বর্গকে পাঁচ সেটের দীর্ঘ লড়াই চালাতে হয়েছে। প্রচণ্ড মানসিক বলের অধিকারী এই 'সুইডি' দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতের বিজয় অমৃতরাজের কাছ থেকে যে বাধা পায় তারপর আর প্রতিরোধ পেল এই ফাইনালে। তৃতীয় রাউণ্ডে তার পুরোন উরুর আঘাতে আবার আঘাত লাগলেও সে উদ্যোগ হাতছাড়া করেনি। সেমিফাইনালে সে তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকান জিমি কোনর্সকে ৬-২, ৬-৩, ৬-২ গেমে নির্মমভাবে হারাতে বাধ্য করে, যেমন করেছিল দেড় লক্ষ ডলারের পেপসি কোলা গ্রাণ্ড স্লাম টেনিসের ফাইনালে (৬-২, ৬-৩)

প্রথমবার উইম্বলডন ফাইনালে যাওয়ার পথে ট্যানার সেমিফাইনালে তেমন বাধা পায়নি। কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশীয় টম গালিকসনের বাধা পেরোতে চার-চার সেট লড়তে হলেও একবারও সার্ভিস হারায়নি সে। এই গালিকসনই প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই বিশ বছর বয়সী জন ম্যাকেনরোকে হারায়।

১৯৭৫ ও ৭৬ সালে ট্যানার সেমিফাইনালে যায় এবং যথাক্রমে কোনর্স ও বর্গের হাতে হেরে বিদায় নেয়।

নাভ্রাতিলোভা দু'বার খেতাব পেল

প্রায় দেড়শো পাউণ্ড ওজনের পাঁচফুট আট ইঞ্চি লম্বা দেশত্যাগী চেক মেয়ে বাইশ বছর বয়সী মার্তিনা নাভ্রাতিলোভা এবারও উইম্বলডন মহিলা সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শুক্রবার ফাইনালে সে গতবারের প্রতিদ্বন্দ্বী দু'বছরের বড় ক্রিস এভার্ট লয়েডকে সরাসরি হারিয়েছে (৬-৪, ৬-৪)। গত বছর ফাইনালে ক্রিস ১০৫ মিনিট লড়াই করে হারে বটে, কিন্তু প্রথম সেটটি জিততে পেরেছিল সে। এবার সময় লেগেছে মাত্র এক ঘণ্টা। কারণ এবার নাভ্রাতিলোভা ছিল অনেক বেশি আক্রমণাত্মক।

শেষ পয়েণ্টটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে র‍্যাকেটটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে অভ্যেস মতো দু হাত তুলে উল্লাস প্রকাশ করে। পরে সে বলে, গতবারের চেয়েও এবার আমি জিততে চেয়েছি অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে।

রমেশ জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন

ভারতীয় টেনিস কিংবদন্তীর নায়ক রমানাথন কৃষ্ণাণের পুত্র রমেশ এবছর জুনিয়র উইম্বলডনে সিঙ্গলস খেতাব জিতেছে। শনিবার সে ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড সিগলারকে হারায় (৬-১, ৬-২)।

কলকাতা ফুটবল ঃ নতুন সংযোজন মোহন ছেত্রী

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ বর্মার অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবলার মোহন ছেত্রী মোহনবাগানে খেলার জন্য কলকাতায় এসেছে। মোহন বর্মার 'সান' রাজ্য দলের খেলোয়াড়। ওখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইণ্টার স্টেট ফুটবল প্রতিযোগিতায় ও সান দলের প্রতিনিধিত্ব করে। সান দল এই প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েক বছরের চ্যাম্পিয়ন। মোহন ছেত্রীর প্রথমে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে আসার কথা ছিল বছর খানেক আগে। কিন্তু এখানে ওর পৌঁছতে দেরী হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে ইস্টবেঙ্গল কয়েকজন ভিন্ রাজ্যের খেলোয়াড় জড়ো করায় ওকে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। মোহনবাগান মোহনকে তুলে নিয়েছে। এই লেখা প্রেসে যাচ্ছে মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দু'দিন আগে। লেখাটি প্রকাশ হবার আগে হয়তো ওকে মোহনবাগানে খেলতেও দেখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, ১৯৬৩ সালে সিংহল থেকে নূর কলকাতায় এসে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মোহনবাগানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমেই গোল করেছিলেন। ভিন্দেশী খেলোয়াড় এখানকার কোন ক্লাবে নাম নথিভুক্ত করার পর যে কোন সময় থেকেই খেলতে পারে। মোহনের লেফট হাফে খেলা পছন্দ হলেও যে কোন সময়ে জায়গা পরিবর্তন করে খেলতে পারে। এবং মোহনবাগানে সম্ভবত লেফট স্ট্রাইকার পজিশনে খেলতে দেখা যাবে। মোহনবাগান-টালিগঞ্জ ম্যাচের পর সন্ধ্যেবেলায় আমরা কথা বলছিলাম। ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতা ও ১২৬ পাউণ্ড ওজনের মোহন ছেত্রীর মুখের আদলটা অনেকটা বাঙালীর মত, কানের উপর দিয়ে চুলগুলো বিছানো। মোহন ইংরাজীতে রপ্ত নয়, কথা বলছিল নেপালী ভাষায়। আমাদের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ করছিলেন ডিক চ্যাটার্জি। এই ডিক চ্যাটার্জি এবং বিমল কুমার বসুই ওকে এখানে খেলানোর ব্যাপারে যোগাযোগ করিয়ে দেন।



মোহন ছেত্রি

মোহনকে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল—আজ কি রকম খেলা দেখলে। ওর জবাব—একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, বিশেষ কিছু জায়গা থেকে খেলোয়াড়েরা গোলে কেন সট নিচ্ছিল না। ওইসব স্পট থেকে অবশ্যই গোলে সট করা উচিত। কারণ, এক্ষেত্রে গোল লাভের সম্ভাবনাও প্রবল।

২৫ বছর বয়স্ক মোহনকে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল—কলকাতার দর্শক সম্পর্কে। ও বলল—এখানকার অধিকাংশ সাপোর্টাররাই শুধু নিজের দলকে সমর্থন করে এবং এক্ষেত্রে তারা কিছু বায়াস্ড্।

মোহন জাতে নেপালী হলেও ওর জন্ম বর্মায়। ওর বাবা-মা পঁচিশ বছর হল বর্মায় বাস করছেন। ওখানে মোহনের বাবার বিরাট ব্যবসা। হাই স্কুল পাশ করার পর ও ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে। আর মগ্ন আছে ফুটবল নিয়ে। স্কুল জীবন থেকেই ওর ফুটবলের সঙ্গে বন্ধন। তারপর থেকে বর্মায় ও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বর্মা জাতীয় দলেও মোহন নির্বাচিত হয়েছে। ওখানকার পাহাড়ী জায়গা কালাও-য়ে ওরা থাকে। মোহন এখানে এসেছে ফুটবল খেলতেই। দেখা যাক, কলকাতার জন্য ওর পা দুটোয় কি রাখা আছে।

বলো দেখি

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

১। মন বলে হার নয়
গোল কিছু করব।
পাঁচনদ ছেড়ে তাই
বঙ্গের পূর্ব। উত্তর ঃ মনজিত

২। কেরালায় কারা চায়
চাকা টাকা বানাতে
তার চেয়ে এই লিগে
এসো কলকাতাতে।
উত্তর ঃ পায়াস অথবা নাজিব

৩। ক্যারিবিয়ানের ছেলে
ব্যাট করে বালিতে
স্বদেশী নামটি দেখ
চরণের কালিতে।
উত্তর ঃ কালীচরণ

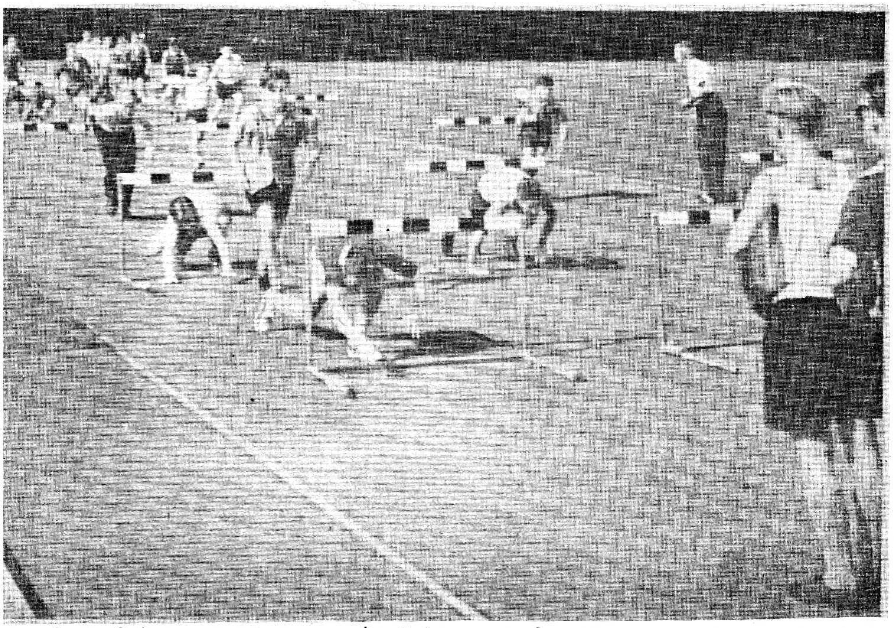
৪। ক্রিসকে উলটে দিল
বাঁ হাতের ভলিতে
বেশ কিছু দম লাগে
যার নাম বলিতে।
উত্তর ঃ মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

ভলিবলে পুলিশ দ্বিতীয় ডিভিসনে

আট বছর পরে কলকাতা পুলিশের ভলিবল দল দ্বিতীয় ডিভিসনে অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিসনে উঠেছে। কলকাতা পুলিশ ভলিবল দলের সাম্প্রতিক কৃতিত্বের মধ্যে আছে পশ্চিমবাংলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত শঙ্কর স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড ও দেবাশিস হালদার স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড জয়।

কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (৪)

স্বরাজ ঘোষ



ফুটবলের ফিটনেসের প্রয়োজনে অ্যাথলেটিক্স ফিটনেসের অনুশীলন হচ্ছে ১০—১২ বছর বয়সের ছেলেদের। স্থান পশ্চিম জার্মানির হেন্নেফ স্কুল। দূরে প্রশিক্ষক ছাত্রদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষার্থী পরিচালিত হতে পারলেই শিক্ষাগ্রহণ হয় মর্মস্পর্শী ও ফলপ্রদ। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁথি-পাটার উপর জোর। কিন্তু পুঁথি-পাটার শক্তি সীমিত। এই সীমিত ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন না হলে শিক্ষার্থীর পুঁথি-পাটার মোহজালে আটকে পড়ার সম্ভাবনা। তাই গ্রন্থের শব্দার্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে মর্মার্থের উপর জোর দিয়েই শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে সঠিক ধারণা দিতে হয়।

ফুটবল আসুরিক খেলা। এই খেলায় আছে দৌড়, ঝাঁপ। সেটাকে মূলধন করেই ফুটবল খেলা। এইজন্য এই খেলাকে আবার বলা যায় অ্যাথলেটিক গেম'। অ্যাথলেটিক ফিটনেসকে কেন্দ্র করেই আধুনিক ফুটবলের যত পরিকল্পনা ও ক্রীড়া-কৌশল। বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই অ্যাথলেটিক্স ফিটনেস-এর মর্মার্থ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের দেশের আধুনিক খেলোয়াড়গণ মোটেই সচেতন বা শিক্ষিত নয়। অ্যাথলেটিক্স কার্যকলাপ বলেই স্পর্শও আমরা আধুনিক ফুটবলকে উপেক্ষিত করতে পারছি না। তাই গোলের কাছে পৌঁছেও গোল করতে পারি না। যারা অনুগামী, তাদের চোখে ব্যর্থতাই ধরা পড়ছে। তারা তো এই অনুসরণ করছে।

অ্যাথলেটিক্সকে বাদ দিয়ে সারা বিশ্ব ফুটবলের কথা ভাবতেই পারে না। গতিশীল ও বেগবান ফুটবলে গোলকিপার পজিসন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিভাগে অ্যাথলেটিক্স উপাদানের উপর ভিত্তি। আমরা এখন একটা দামী শব্দার্থ জেনেছি তা হল—'টোটাল ফুটবল'। শব্দার্থ নিয়ে যত বাড়াবাড়ি করছি, এর মর্মার্থ নিয়ে কি করছি? এই শব্দার্থ অনুযায়ী কোন খেলোয়াড়কে সেই স্তরে পৌঁছতে হলে সব বিষয়ে সর্ব বিভাগে কুশলী খেলোয়াড় হতে হয়। তার জন্য চাই, উপাদানের মর্মার্থ অনুযায়ী অধ্যাবসায় বা প্রস্তুতি।

এবার একটু অতীতের ফুটবলের দিকে ফিরে যাই। যাদের কথা শুনলে বা বললে আধুনিক খেলোয়াড় বা আধুনিক ফুটবল অনুরাগীদের ঘৃণা জাগে। তারা অতীত হলেও কীর্তিমান হয়ে ইতিহাস হয়ে আছেন, কেন জান? আজ যদি তারা এ যুগের খেলোয়াড় হতেন। তাহলে, আমার ছোট বন্ধুরা বুঝতে পারতে 'টোটাল ফুটবলার' কাকে বলে। এদের কয়েকজনের নাম তুলে ধরলাম—বলাই চ্যাটার্জি, হাইজাম্প, লংজাম্প ও হার্ডলসে চ্যাম্পিয়ন। আবার সমস্ত বিভাগে খেলতে পারতেন। ছোনে মজুমদার (ক্রিকেট, হকি, ফুটবল), ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ ও ব্রডজাম্পে বিজয়ী। সমস্ত বিভাগে ফুটবলে পারদর্শী। সুধাংশু বসু, (মোহনবাগানের আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়), ৪০০ মিঃ, ৮০০ মিঃ, ২০০ মিঃ-এ বিজয়ী। সমস্ত বিভাগে খেলতে পারতেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত, (ইস্টবেঙ্গল), ১৫০ মিঃ, ২০০ মিঃ, হাইজাম্প, ব্রডজাম্প-এ বিজয়ী। রাখাল মজুমদার, (ইস্টবেঙ্গল) ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ-এ বিজয়ী। অনিল দে, (মোহনবাগান), ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ-এ বিজয়ী। সর্ব বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে খেলেছেন সুনীল চ্যাটার্জি, (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), (ফুটবল, বাস্কেটবল ও ভলিবল), ৪০০ মিঃ, হাইজাম্প, ব্রডজাম্প-এ চ্যাম্পিয়ন, সব জায়গায় খেলতে পারতেন। টি আও (১৯৪৮ সাল ওলিম্পিকের অধিনায়ক), ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ, ৪০০ মিঃ, হার্ডলস, জেভেলিন থ্রো ও ডিসকাসে ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন। সব বিভাগে খেলতে পারতেন। আর রোজারিও, (ই বি আর) ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ ও ব্রডজাম্পে চ্যাম্পিয়ন ও বক্সিং চ্যাম্পিয়ন। তিনি গোলকিপার ছিলেন ও ১৯৩৮ সালে ভারতীয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। সনৎ শেঠ, পোলভল্টে বিজয়ী। সুভাশীষ গুহ, ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ ও হাইজাম্পে বিজয়ী। পদ্ম মিত্র, ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ ও পোলভল্টে বিজয়ী তিনি সব বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে খেলেছেন।

বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশে 'কমপ্লিট ফুটবলার' হওয়ার স্বার্থে স্কুলের ১০—১২ বছরের ছেলে থেকেই অ্যাথলেটিক্স-এর কার্যকলাপ প্রায় বিশবছর আগে থেকেই প্রশিক্ষণ চালু হয়ে গিয়েছে। রুশ ও পূর্ব জার্মানিদের তো কথাই নেই। তাদের অ্যাথলেটিক্স বাধ্যতামূলক। এদিকে আবার পশ্চিম জার্মানির হেন্নেফ স্কুল ও কোলন ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ বছর আগে থেকেই ফুটবলের প্রয়োজনে অ্যাথলেটিক্স ফিটনেস করাচ্ছে।

(চলবে)

[ফুটবল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থাকলে 'খেলার আসরে'র ঠিকানায় স্বরাজ ঘোষের নামে চিঠি লিখতে পারেন—সম্পাদক]।

মস্কো '৮০ ওলিম্পিকে মুষ্টিযুদ্ধের আসর কেমন হবে ?

অতীন সরকার ঃ মুষ্টিযুদ্ধের আসরের কথা উঠলেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে রক্তাক্ত বিকৃত মুখ আর সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্যাসিয়াস ক্লে'র সদম্ভ-দৃপ্ত মুখ। এতো হল পেশাদার মঞ্চের দৃশ্য। এর বাইরে অথবা সবার উপরে অপেশাদার প্রতিযোগী মুষ্টি যোদ্ধাদের মিলন মঞ্চ হল ওলিম্পিকের আসর এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ। তবে ওলিম্পিকের সম্মানই বেশী।

১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিতব্য ওলিম্পিকের আসরও খুব আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই। এই আসর বসবে প্রোস্পেক্ট মীরা এর কাছে ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে। এটি ইউরোপের বৃহত্তম ইণ্ডোর স্টেডিয়াম। এতে বসবার জায়গা ৪৫ হাজার দর্শকের। এখানে একই সঙ্গে দুটি প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে পার্টিশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এবং ওলিম্পিকের সময় এই ব্যবস্থা মত একদিকে বক্সিং ও অন্যদিকে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে এই স্টেডিয়ামটির অন্যান্য সুযোগের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ইণ্ডোর স্টেডিয়ামটিই ফুটবল, আইস হকি, ফিগার স্কেটিং, জিমন্যাস্টিক্স প্রভৃতি প্রতি-যোগিতার জন্যও ব্যবহার করা হয়।

ওলিম্পিক ক্রীড়া তালিকা

প্রতিযোগিতার প্রথম দিন থেকেই বক্সিং প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ২০ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত প্রাথমিক (প্রিলিমিনারি) প্রতিযোগিতা। ২৯ ও ৩০ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনাল এবং ৩১ জুলাই সেমিফাইনাল। ১ আগস্ট বিরতি এবং ২ আগস্ট ফাইনাল। প্রাথমিক প্রতিযোগিতা হবে প্রতিদিন ২ দফায় দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে তিনটা এবং বিকেল ৬টা থেকে ১০টা। কোয়ার্টার ফাইনাল বেলা ১টা থেকে ৪টা ও রাত ৭টা থেকে ১০টা। সেমিফাইনাল—বেলা ১টা থেকে সাড়ে ৩টা ও রাত ৭টা থেকে ১০টা এবং ফাইনাল বেলা ৩টা থেকে রাত ৭টা।

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

বিশ্বে উনবিংশ শতকে মুষ্টিযুদ্ধ খেলাধূলা হিসাবে গণ্য হয় কিন্তু প্রথম দু'টি ওলিম্পিকে (১৮৯৬/১৯০০) মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার বিষয়ভুক্ত ছিল না। ১৯০৪ সালে সেন্ট লুইস এ (ইউ এস এ) তৃতীয় আধুনিক ওলিম্পিকে সাতটি ওজন (ওয়েট) বিভাগে মুষ্টিযুদ্ধ হয় এবং সব কয়টি সোনা ও রুপো একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অধিকার করে।

২০তম ওলিম্পিকে কিউবার মুষ্টিযোদ্ধার দল বিচারে প্রথম হয়েছিলেন এবং পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও রোমানিয়ার মুষ্টিযোদ্ধারা চমৎকার ভাবে লড়েছিলেন।

১৮৯৮ সালে রাশিয়ায় প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ লড়াই হয় সেন্ট পিটার্সবার্গে (বর্তমান লেনিন-গ্রাদ) দুজন পর্যটক ব্রিটিশ মুষ্টিযোদ্ধার মধ্যে। তার ১৫ বছর পর শুরু হয় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হবার (১৯১৭) প্রথম যুগে মুষ্টিযুদ্ধে দ্রুত আগ্রহ দেখা যায় এবং ১৯২৬ সালে প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন-শিপ হয়। ১৯৩০ সালের শেষ দিকে প্রাক-যুদ্ধ কালে সোভিয়েতে মুষ্টিযুদ্ধ বেশ জমে ওঠে। বিদেশ থেকে আগত বিশেষজ্ঞরা মুষ্টি-যুদ্ধে সোভিয়েত পদ্ধতির উচ্চ প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তারা দস্তানা খুলে অস্ত্র নিয়ে রণাঙ্গনে চলে যান।

১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধারা প্রথম অবতীর্ণ হয়ে দু'টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক পান এবং বেসরকারী শ্রেণী বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন ওলিম্পিকে সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধা দল প্রথম ওলিম্পিক সাফল্যের বিজয় মুকুট লাভ করেন। ব্রিটেন, রোমানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে এরা স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভ্লাদিমির সায়োনফ, ভ্লাদিমির ইয়েনেসিবারিয়ান এবং গেন্নাদি শাতকভ জয়ী হন।

১৯৬০ সালে রোমে অনুষ্ঠিত পরবর্তী ওলিম্পিকে এরা চতুর্থ স্থানে নেমে যান। আর চার বছর পরে টোকিও ওলিম্পিকে জয়ী হন সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধা স্তানিসলাভ স্তেপাশকিন, বোরিশ লাগুতিন এবং ভ্যালেরি পোপেন-চেনকো স্বর্ণপদক পান। সর্বোপরি ওলিম্পিকের সর্বোচ্চ সম্মান—বার্কার কাপ জেতেন পোপেনচেনকো।

১৯৬৮ সালে মেক্সিকো ওলিম্পিকে সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধাদের ভূমিকাও ছিল আকর্ষণীয়। বোরিস লাগুতিন দ্বিতীয়বার স্বর্ণপদক পান। আর ভালেরিন সোকোলভ এবং দান পোজদানিয়াকও স্বর্ণপদক পাওয়া সোভিয়েত দল ওলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

১৯৭২ সালে মিউনিক ওলিম্পিকে সোভিয়েত দল ভীষণ পিছিয়ে পড়ে এবং চতুর্থ স্থানে নেমে যায় এবং ১৯৭৬ সালে ২১তম মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে আরও পিছিয়ে পড়ে মাত্র ১টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়।

সম্প্রতি সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধা নবাগতদের আন্তর্জাতিক বিজয়গুলিতে এটাই দেখা যাচ্ছে মুষ্টিযুদ্ধ পুনরুজ্জীবিত হতে যাচ্ছে। বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত বিশ্বমুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়নশিপে ভালেরী লুভভ, ভালেরী রাচকভ এবং ভিক্টর সাভচেনকো স্বর্ণপদক জেতেন। তারা সকলেই উঁচুদরের মুষ্টিযোদ্ধা হবেন এটা তারই লক্ষণ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আশা করে ২৪ থেকে ২৫ বছর বয়সের সামিল সাবিরভ, আলেক্সাণ্ডার মিখাইলভ ও ভ্লাদিমির ইয়েরো ফেয়েভ ওলিম্পিক অঙ্গনে যোগ্য ভূমিকা নিতে পারবে।

এই ২২তম মস্কো ওলিম্পিকে ৬০টির বেশী দেশ থেকে ৪০০ এর বেশী মুষ্টিযোদ্ধা যোগ দেবেন বলে উদ্যোক্তারা আশা করেন।

তার থেকেও বড় কথা হল এই বিশ্ব সম্মানের অধিকারী হতে পারবেন তারাই যারা সত্যিই উপযুক্ত। কারণ তাদের উন্নত কারিগরি জ্ঞানসম্মত সরঞ্জাম ও উপযুক্ত রেফারিদের পাল্লায় পড়তে হবে।

অমনি ছেড়ে দেব না—কিউবা

বিশ্ব অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ডোনাল্ড হাল মনে করেন, ১৯৭৬ সাল অপেক্ষা ১৯৮০ সালে মস্কোতে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হবে উচ্চমানের। এর মূল প্রতিযোগিতা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ বছর বয়স্ক দুই মুষ্টিযোদ্ধা—রকি লকরিজ (৫৪ কেজি) ও জেফ ম্যাক্‌ক্যাকেন (৭৫ কেজি) বিশেষ ভূমিকা নেবেন বলে তিনি মনে করেন। এ পি এন সংবাদ-দাতাকে তিনি ওই কথা বলেন।

কিউবা মুষ্টিযোদ্ধা দলের প্রশিক্ষক আলসিণ্ডো জাগারা বিনয়ের সঙ্গে এ পি এন সংবাদদাতাকে বলেন—'ওলিম্পিক আসরে আমরা বেশী হলে দ্বিতীয় স্থান পেতে পারি বলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন। সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধারা আমাদের বিশেষ বন্ধু, কিন্তু সর্বোচ্চ স্থান তাদের আমরা সহজে ছেড়ে দেব না।'

যুগোশ্লাভ বক্সিং ফেডারেশনের প্রধান ডানিলো ইভানোভিচ ওই সংবাদদাতাকে বলেছেন, তারা জানেন আসন্ন ওলিম্পিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে শীর্ষস্থান দখল করা খুবই কঠিন। তবু ক্যাসারভ ভ্রাতৃদ্বয়, টাডিজা ও স্লোবোডা, রুসেভাঙ্কি এবং মিরকো পেরুনোভিক যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিন্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইণ্ডাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৬৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

জয় ফুটবল জয়

আলেখ্য ঃ ভাল্টার নয়গেবাউয়ার
অনুবাদ ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 13th July 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



সুমতি চক্রবর্তী (সাঁতার) /পাহাড়ী রায়চৌধুরী